

- ◆ লেনিন ও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা : দেশে দেশে মুক্তির লড়াই : পৃষ্ঠা ৪
- ◆ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সিরাজুল আলম খান : পৃষ্ঠা ১০

- ◆ প্রবাসী শ্রমিকদের দুর্ভোগ এবং প্রতারণা বন্ধ করতে হবে : পৃষ্ঠা ১২
- ◆ কোটা ব্যবস্থার সংস্কার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির আন্দোলন শক্তিশালী করুন : পৃষ্ঠা ১৬

দুর্নীতিবাজরা দেশ ছেড়ে পালালো কীভাবে?

দুর্নীতি, পাচার ও খেলাপিখণের টাকা উদ্ধার করে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কর



দুর্নীতি-দুঃশাসন, লুটপাট, অর্থপাচার, খেলাপি ঋণ, ব্যাংক ডাকাতি রোধ; কালোটাকা, পাচারের টাকা উদ্ধার; আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন সম্পদ বাজেয়াপ্ত; দুর্নীতিবাজ, ঋণখেলাপি, অর্থপাচারকারী ও তাদের সহযোগীদের গ্রেপ্তার-বিচারের দাবিতে এবং ফ্যাসিবাদী সরকার উচ্ছেদের লক্ষ্যে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ২ জুলাই '২৪ জাতীয় প্রেসক্রাবের

সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর পর বিক্ষোভ মিছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দিকে যাওয়ার সময় পল্টন মোড়ে পুলিশ ব্যারিকেড দিলে সেখানে রাজপথে অবস্থান নিয়ে নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি

বাম গণতান্ত্রিক জোট

ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কমরেড শাহীন রহমান, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইকবাল কবীর জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশেরফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় নেতা রাশেদ শাহরিয়ার ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী। সমাবেশ পরিচালনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য খালেদুজ্জামান লিপন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের ছত্রছায়ায় দুর্নীতি-লুটপাট, অর্থপাচার, ঋণখেলাপির মাত্রা অবিশ্বাস্য হারে বেড়েছে। সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজীর সরকারের উচ্চ পদে থাকা অবস্থায় রিসোর্ট, জমি-ফ্লাট বাড়ি, নগদ অর্থসহ বিপুল অর্থ-বিলম্বভেদের মালিক হয়েছে। একদিকে শুদ্ধাচার পুরস্কার ও বিপিএমসহ একটার পর একটা খেতাব পেয়েছে, আরেকদিকে অবৈধ সম্পদ বাড়িয়েছে। সাবেক সেনা প্রধান আজিজ, অবৈধভাবে হত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি নিজের ভাইদের রাষ্ট্রপতির ক্ষমা আদায়ে প্রভাব খাটিয়েছে। এমনকি ফিলিস্তিনে ধারাবাহিকভাবে গণহত্যাকারী

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দেশের অবস্থা বদলাতে হলে

শোষণমূলক ব্যবস্থা

বদলাতে হবে

কাজির গরু কাগজে আছে গোয়ালে নাই—একইভাবে মুক্তিযুদ্ধের গণআকাঙ্ক্ষা গণচেতনা—যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নামে খ্যাত তা কাটাছেড়ার পরও যতটুকু সংবিধান নামক পুস্তকের কাগজে লেখা আছে, তা বাস্তবে খুঁজে পাওয়া কঠিন। চেতনাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করা হয়েছে। গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। জনমত যাচাইয়ের ভোট এখন ভোটের বর্জিত জবরদখলের তামাশায় পর্যবসিত হয়েছে। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও জালজালিয়াতির হাতেখড়ি হয়েছিল। তারপর থেকে হ্যাঁ-না ভোট, তদারকি ভোট, মার্শাল ল ব্যাক-আপ ভোট সেরে ২০১৪-তে ভোট ছাড়া ১৫৩ আসন তথা ক্ষমতারোহণ, ২০১৮-তে নিশি রাতে ভোটের অর্ধেক কাজ সম্পন্নকরণ ও ২০২৪ সালে আমি-ডামি নির্বাচনে একদলীয় কর্তৃত্ববাদী শাসন পাকাপোক্ত করতে পারলেও রাষ্ট্রীয় প্রশাসন-প্রতিষ্ঠানের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে দুর্নীতির ঘুণে ধরা বিকলাঙ্গে পরিণত করা হয়েছে। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর দুই সাবেক প্রধানসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের লুটপাট চিত্র হতবাক করা আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কানাডার বেগম পাড়ায় যে সব বাড়িঘরের খোঁজ সাবেক এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সংকটের চক্রে ঘূর্ণায়মান বাজেট ২০২৪-২৫

কর, বৈদেশিক ঋণ, দ্রব্যমূল্যের বোঝা বাড়াবে

অর্থনৈতিক নানা সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে গত অর্থবছর। সামনের বছরে সংকটগুলো থাকবে নাকি কাটবে সেই বিতর্কের যেমন সমাধান দরকার তেমনি একটা পথ নির্দেশনাও দরকার। বাজেটকে সংবিধানে বলা হয়েছে সরকারের আর্থিক বিবরণী। এই বিবরণী থেকে সংকটের কারণ ও উত্তরণের উপায় জানা যাবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু এবারের অর্থ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট কি তেমন হলো, নাকি সংকটের চক্রে ঘূর্ণায়মান বাজেট হিসেবেই প্রণীত হলো? বিগত বছরের অর্থনৈতিক সংকটের কারণ দূর না হলে তো অর্থনীতি সংকটের চক্রেই ঘুরপাক খেতে থাকবে। বাজেট প্রণয়ন করে সরকার, বাজেট থেকে সাফল্য না এলে তার দায় নিতে হয় সরকারকেই। কিন্তু বাস্তবে দায় বহন করে জনগণ। জনগণের উপর চেপে বসে নতুন নতুন কর ও ভ্যাট বৃদ্ধির বোঝা যা জনজীবনে দুর্ভোগ বাড়িয়ে তোলে। তাই বাজেটের আলোচনা হলেই মানুষ শুনতে চায় কোন কোন জিনিসের দাম বাড়লো, কমলো কি কোন কিছুর দাম? ক্ষমতাসীনরাও বাজেটের মূল বিষয়টি আলোচনায় না এনে সাধারণ মানুষকে আটকে রাখতে চায় দাম বাড়ার কমা আলোচনাতেই।

স্বাধীনতার পর ৫৩তম বাজেট ঘোষিত হয়েছে। প্রতিবার বাজেটের সময় বলা হয় এবারের বাজেট স্বাধীনতার পর সর্ববৃহৎ বাজেট। এবারও তাই হয়েছে। তবে আইএমএফ এর পরামর্শ মেনে কিছুটা সংকোচন করে আগামী অর্থবছরের জন্য ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে, যা গত বাজেটের তুলনায় টাকার অঙ্কে ৩৫ হাজার ২১৫ কোটি টাকা বেশি। যা জিডিপি ১৪ দশমিক ২০ শতাংশ। গত কয়েক বছরে যেভাবে বাজেটের আকার বাড়ছিল এবার তেমন বাড়েনি এবং জিডিপির অনুপাতে এটি গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ছোট বাজেট। কিন্তু বাজেট ছোট হলেও সরকারি ব্যয় কমে নাই বরং কর বাড়িয়ে আয় বাড়ানোর নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। গত অর্থবছরে জনজীবনে যে দুর্ভোগ নেমে এসেছিল তার কারণ ছিল দ্রব্যমূল্য ও মূল্যস্ফীতি, টাকার মানের অবনমন, ডলার সংকট ও ডলার পাচার, বিদেশি ও দেশি ঋণ এবং তাদের সুদ পরিশোধ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, রিজার্ভ সংকট ও ব্যাংক খাতে লুটপাট। সারা বছর এসব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে কিন্তু এই সংকট নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় সংকট ক্রমাগত ঘনীভূত হচ্ছে। এ

থেকে পরিত্রাণের কোন পথ নকশা দেখা যাচ্ছে না বাজেটে।

বাজেটের আয়তনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সংশোধিত বাজেটকে ভিত্তি ধরা হলে আগামী বাজেটের আকার বাড়ছে ৮২ হাজার ৫৮২ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাড়ানো হয়েছিল ১ লাখ ১ হাজার ২৭৮ কোটি টাকা। সেই বিবেচনায় বাজেটের আকার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছুটা লাগাম টেনে ধরা হয়েছে।

এই বাজেটে ৫ লাখ ৪১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪ লাখ ৯৫ হাজার কোটি টাকা হচ্ছে কর। করের মধ্যে এনবিআর নিয়ন্ত্রিত অংশ ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা এবং এনবিআরবহির্ভূত ১৫ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া করবহির্ভূত প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ৪৬ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে। আর অনুদান পাওয়া যাবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে ৪ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। ফলে বাজেটে ঘাটতি থাকছে। অনুদান ছাড়া বাজেট ঘাটতি ধরা হচ্ছে ২ লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। তবে অনুদানসহ সামগ্রিক ঘাটতি দাঁড়াবে ২ লাখ ৫১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা।

ঘাটতি মেটানোর দুইটি খাত আছে। প্রথমত, বৈদেশিক ঋণ, দ্বিতীয়ত দেশের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ নেয়া। বৈদেশিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হচ্ছে ১ লাখ ২৭ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এই ঋণ থেকেই বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা হবে ৩৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। ফলে নিট বৈদেশিক ঋণ দাঁড়াবে ৯০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। বাকি ঘাটতি পূরণে অভ্যন্তরীণ ঋণ নেওয়া হবে ১ লাখ ৬০ হাজার ৯০০ কোটি টাকা, যা চলতি অর্থবছরের মূল অভ্যন্তরীণ ঋণের লক্ষ্যমাত্রা থেকে ৪ হাজার ৭০৫ কোটি টাকা বেশি। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে ব্যাংক খাত থেকে নেওয়া হবে ১ লাখ ৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, আর সঞ্চয়পত্র বিক্রিসহ ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ নেওয়া হবে ২৩ হাজার ৪০০ কোটি টাকা।

আগামী অর্থবছরের বাজেটে ব্যয়ের মধ্যে পরিচালন অংশ বা রাজস্ব বাজেট ৫ লাখ ৬ হাজার ৯৭১ কোটি টাকা। আর উন্নয়ন অংশ বা উন্নয়ন বাজেট ২ লাখ ৮১ হাজার ৪৫৩ কোটি টাকা। উন্নয়ন অংশের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকা। ফলে বাজেট বাস্তবায়নে সরকারকে এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

দেশের অবস্থা বদলাতে হলে শোষণমূলক ব্যবস্থা বদলাতে হবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেয়েছিলেন তার বেশিরভাগ আমলাদের বলে ঘোষণা দিলেও নাম প্রকাশ করেননি। পার্লামেন্ট সদস্য একজন দুর্নীতির অভিযোগে বিদেশে জেল খাটছেন, আরেকজন সোনা চোরাচালান ব্যবসার ভাগ বাটোয়ারা এবং নিজ দলের রাজনৈতিক বিবাদে ভারতে গিয়ে খুন হন। এমপি-মন্ত্রীদের হলফনামা থেকে জানা যায়, ২০১৮ সালের তুলনায় এদের সম্পদ ২২৩৮.১০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, এদের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের ৫ বছরে আয় বৃদ্ধির হার ২,৪০৯.৬৮%। এমপিদের ৫ বছরে অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির হার ৫,৪৭০.৬৩%, স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের ৩৮.৪২৩.২১%। কারো সম্পদ আগের অবস্থায় রয়েছে কিংবা কমেছে তেমন দেখা যায়নি। ক্ষমতাসীন দলের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে ৫ মাসে ২৮ জন খুন হয়েছে। বুড়িগঙ্গা তীরের দেড় কিলোমিটার দখল করে এমপি, ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতারা ২৭টি ডক ইয়ার্ড বা নৌযান তৈরি, মেরামত কারখানা বানিয়েছেন। সুন্দরবনের কোল ঘেষে ১৪টি রিসোর্ট বানিয়েছে, আরও ৮টি নির্মাণাধীন। জলাভূমি দখল ও গাছকাটা হচ্ছে বেপরোয়াভাবে। ৪ মাসে ২ হাজার একর প্যারাবন দখল করে গাছ কেটে ৩৭টির বেশি চিংড়ি ঘের তৈরি করেছে আওয়ামী লীগ

নেতারা। এ ধরনের অসংখ্য খবর নিত্যদিনের পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। দুর্নীতির রাস্তা আইনগত ফাঁকফোকর যেমন, কালোটাকা (চুরির টাকা) সাদা করার বিধান চালু রাখা ও গোষ্ঠী বিরোধে বা নানা দ্বন্দ্ধে চেপে রাখতে না পারা দুর্নীতি চিত্র কিছুদিন পার করা ও উচ্চ আদালতকে দিয়েও বড় দুর্নীতির তদন্ত বন্ধ রাখার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা, সুবিধামতো দু-একটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে তথাকথিত ‘জিরো টলারেন্স’ এর ফাঁকা বুলি আওড়ানো হয়। জিরো টলারেন্স বা শূন্য সহনশীলতা কথাটা অর্থহীন। কারণ অন্যায়ের প্রতি সহনশীলতা শূন্য পার্সেন্ট হবে না ১, ২, ১০, ২০ পার্সেন্ট হবে তার কোন মানে নেই। বলা দরকার এবং মেনে চলা দরকার নীতিভিত্তিক আইনের শাসন। দুর্নীতি প্রশয় পায় এমন সব প্রথা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও নজরদারি-জবাবদিহিতার ঘাটতি দূর করা। সাম্প্রতিককালে ২৬টি সরকারি পাটকল বন্ধসহ রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা ও সম্পত্তি নামমাত্র দামে ব্যক্তি মালিকদের হাতে তুলে দেয়ার ধারাবাহিকতা চালু আছে, অথচ রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা দেখভালের নামে মাথাভারী ৬টি কর্পোরেশন গত একযুগে ২১ হাজার কোটি টাকা লোকসান গুনেছে আর লাভ দেখিয়েছে মাত্র ৫৭ কোটি টাকা। অথচ শ্রমিকের মজুরি বাংলাদেশে

বিশ্বের সবচেয়ে কম। এখন আবার মালিক ও সরকারের পক্ষ থেকে অনিয়ম, অনাচারের বিরুদ্ধে ও শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির প্রেক্ষিতে প্রতিবাদের ভাষা বন্ধ করার জন্য আয়োজন চলেছে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা বিল পাশের। শ্রম আইন গণতান্ত্রিক করার ক্ষেত্রে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে চলছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করার কুফল বহুদিক থেকে ভেসে উঠছে। প্রকৃত শিক্ষা বর্জিত সার্টিফিকেট অর্জনের সংখ্যা বাড়ছে। একই সঙ্গে শিক্ষার সিঁড়ি থেকে ঝরে পড়া সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধনী-দরিদ্র, শহর-গ্রাম, বাঙালি নৃ-গোষ্ঠী, নর-নারী ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়ছে। নারী এবং দরিদ্ররা আরও বেশি সংকটের মধ্যে পড়ছে। শিক্ষা বঞ্চিত শিশু শ্রমে নিয়োজিত ৩৫ লাখ ৩৬ হাজার ৯২৭ শিশু, এর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ১০ লাখ ৬৮ হাজার ৬১২ জন। স্বাস্থ্য চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে ৭০ ভাগ পকেট থেকে দিতে হয়। সামর্থ্যবানরা বিদেশে যান। সরকারি কর্তা ব্যক্তির৷ সর্দি-কাশিতেও বিদেশগামী হন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাল বুঝা যায় যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি আনোয়ার হোসেনের বক্তব্যে। তিনি বলেন, ‘আমি ভাইস চ্যান্সেলরদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ভিসি হিসাবে পরিচিত। সেই আমিই ছাত্রলীগের দৌরাট্চার কাছে অসহায়

দুর্নীতিবাজরা দেশ ছেড়ে পালালো কীভাবে? দুর্নীতির টাকা উদ্ধার করে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ কর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইসরায়েলের কাছ থেকে স্পাই ওয়্যার নামক আড়িপাতার গোয়েন্দা সরঞ্জাম ক্রয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়েছে জেনারেল আজিজ। বেনজীর, আসাদুজ্জামান মিয়া ও ডিআইজি সামছুদ্দোহাসহ সাবেক ও বর্তমান বিভিন্ন পুলিশ কর্মকর্তার দুর্নীতি অবৈধ সম্পদের খবর পত্রিকায় বের হওয়ায় পুলিশ সার্ভিস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে হুমকি দিয়ে বিবৃতি প্রদান ব্যক্তির দায়কে বাহিনীর কাঁধে টেনে নেয়ার শামিল। যা দুর্নীতিকে আরও উৎসাহিত করবে। এনবিআর কর্মকর্তা মতিউর রহমান, সচিব মাহমুদ ফয়সলের অবৈধ সম্পদের খবর বের হওয়ার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি দুর্নীতিবাজ লুটপাটকারী ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সাথে সাথে সামরিক-বেসামরিক আমলাদের অবৈধ সম্পদের খবর। এর আগে করোনার সময়ে রিজেন্ট সাহেদদের ‘কারবার’, স্বাস্থ্য খাতের কেনাকাটায় মিঠু চক্রের বিপুল দুর্নীতি, ক্যাসিনো সম্রাট-খালেদদের ক্ষমতা আর সম্পদ, যুবলীগ নেত্রী পাপিয়াকাণ্ড, ফরিদপুরের দুই ভাইয়ের হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের খবর, রূপপুরের বালিশকাণ্ডসহ নানা ধরনের সরকারি

ক্রয়ে দুর্নীতি, নির্মাণকাজে লোহার রডের পরিবর্তে বাঁশ কাণ্ডসহ নানা ঘটনা বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের গত তিন মেয়াদে ঘটে চলেছে।

সরকার দুর্নীতির প্রশ্নে ‘জিরো টলারেন্স’ এর কথা বললেও বাস্তবে সরকারের প্রশ্নয়েই এরা দুর্নীতি করছে। এর কারণ বর্তমান সরকার গত ৩টি নির্বাচনে আমলা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে জনগণের ভোট ছাড়া ক্ষমতায় বসেছে। ফলে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে না। এরা একে অপরের সহযোগী। দুর্নীতির কথা উঠলেই মন্ত্রীরা পাল্টা প্রশ্ন করেন ‘পৃথিবীর কোন দেশে দুর্নীতি নেই।’ দেশের ব্যাংকগুলো দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। প্রায় ৪ লাখ কোটি টাকার উপরে খেলাপি ঋণ রয়েছে। ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে সরকার কোন যৌক্তিক পদক্ষেপ না নিয়ে বিভিন্ন যেখানে ৩০% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে খেলাপিঋণ রিসিডিউল করার আইন ছিল, গত মেয়াদে সরকার সেটা পরিবর্তন করে ২% দিলেই ঋণ রিসিডিউল করার সুযোগ দিয়েছে। তারপরও খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েই চলছে। ২০০৯

সালে ক্ষমতা গ্রহণের সময় খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ২২ হাজার কোটি টাকা। সেটা এখন ১ লক্ষ ৮২ হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। দেশে কালোটাকা অর্থাৎ চুরি, ঘুষ-দুর্নীতির টাকা মোট অর্থনীতির ৮২ শতাংশ। কালোটাকা উদ্ধার না করে এবারের বাজেটেও ১৫% কর দেয়ার মাধ্যমে কালোটাকা সাদা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দুর্নীতিকে জায়েজ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে গিয়ে ১০টি সমঝোতা স্মারক চুক্তি করেন, যা দেশের স্বার্থবিরোধী। ভারতকে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে রেল-ট্রানজিট করিডোর দেয়ার চুক্তি হয়েছে, অথচ ভারত মাত্র ১৮ কিলোমিটার ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভূটানের সাথে বাণিজ্য ও যোগাযোগ করতে পারে। সেটি তারা দিচ্ছে না। রেলে পণ্যের ও যাত্রীর নিরাপত্তার কথা বলে কিংবা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহ দমন বা চীনের সাথে বিরোধে ভারত সামরিক বাহিনী চলাচল ও নিয়োগ করলে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব মারাত্মক হুমকিতে পড়বে। এছাড়া তিস্তাসহ অভিন্ন নদীর পানির

হয়ে পড়েছি।’ সামাজিক অস্থিরতা ও অপরাধ প্রবণতা ঝড়ের বেগে বইছে। ৮ জুন ঢাকার গুলশানে এক পুলিশ সদস্যের গুলিতে আরেক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

কুড়িগ্রামের রাজীবপুর উপজেলায় অভাবে দিনমজুর ২০ হাজার টাকা ধার করেন। পাওনা টাকার জন্য স্ত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হতে হয়। বিচার না পেয়ে অপমানিত ও উপায়হীন গৃহবধু ও স্বামী একসঙ্গে বিষপান করেন। স্ত্রী মারা যায়, স্বামী মৃতবৎ বেঁচে আছেন। গোটা সমাজে স্বার্থপরতা, ভোগবাদী উন্মত্ততা, সহিংস প্রতিযোগিতা, রাজনীতিতে নীতি-আদর্শবর্জিত গদির লড়াই, স্বৈরতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, লুটপাটতন্ত্রের পাল্টাপাল্টি, কোলাহলে মানুষের মধ্যে হতাশা ছড়ানো হচ্ছে। গদির স্বার্থে জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন করে হলেও সাম্রাজ্যবাদের সাথে নতজানু গাঁটছড়া বাধা হচ্ছে। সবকিছু মিলে এ অবস্থার পেছনে রয়েছে ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থার নাম পুঁজিবাদ। এ ব্যবস্থা অপসারণের লড়াইয়ের মধ্যেই মিলবে অন্ধকারের মাঝে আলোর সন্ধান। সেই পথে সকল বাম গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে এগিয়ে আসতে হবে, বাধভাঙা জোয়ারে প্রাণের প্রবাহ রচনা করতে হবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দুনিয়ায় আজ একই কর্তব্য হাজির হয়েছে। সমাজতন্ত্রই মুক্তি পথ।

ন্যায্য হিস্যা নিয়ে ভারত গত ২০১০ সালে থেকে আশ্বাস দিয়ে একের পর এক তাদের স্বার্থ হাসিল করে নিচ্ছে। অথচ আমাদের সাথে তিস্তা চুক্তি করছে না। সীমান্ত হত্যা বন্ধ, বাণিজ্য ঘাটতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত বৈরী আচরণ করছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, একের পর এক দুর্নীতির খবর বের হওয়ায় দুদক যেন না পারতে অগত্যা লোক দেখানো তদন্ত ও মামলা করছে। কিন্তু দুদক নিজেই ঝুঁজে দুর্নীতির হোতাদের বের করতে পারছে না। দুদকের উপরও জনগণের আস্থা নাই। কারণ ইতিপূর্বে ইয়াবা বদিসহ বিভিন্ন দুর্নীতিবাজকে দুদক সার্টিফিকেট দিয়ে সাধু বানিয়েছে। এতে করে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে দুদকের পদক্ষেপের দুর্বলতা রয়েছে বলে মনে করেন নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশ থেকে একই দাবিতে আগামী ১৬ জুলাই ২০২৪ ঢাকাসহ সারাদেশে দুদক কার্যালয়ের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভের কর্মসূচি ঘোষণা করেন বাম জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নারায়ণগঞ্জে বিজ্ঞান সম্মেলন

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

জায়গায় বনভূমি দরকার। আমাদের আছে অনেক কম, সেক্ষেত্রে ব্যাপক গাছ লাগানো প্রয়োজন। দেশে উন্নয়নের নামে সরকারি উদ্যোগেই গাছ কাটা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গাছ রেখেই রাস্তা সম্প্রসারণ, অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব। শুধু প্রয়োজন সরকারের উপযুক্ত পরিকল্পনা। আমাদের পরিবেশ বিপর্যয়ের পলিথিন একটি বড় কারণ। পলিথিন ব্যবহার বন্ধেও সরকার অকার্যকর।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের জন্য মহাবিপদ নিয়ে আসতে পারে রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প। দুনিয়ার উন্নত দেশ যখন পারমানবিক বিদ্যুৎ থেকে সরে আসছে আমাদের দেশ তখন সেই প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সুন্দরবন আমাদের প্রাণ। সরকার ভারতের সাথে মিলে সুন্দরবনের মধ্যে

তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করেছে। দুনিয়াব্যাপী এ কাজের প্রতিবাদ হয়েছে কিন্তু জনমত উপেক্ষা করেই সরকার রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করেছে। পরিবেশ-জীবন রক্ষায় রূপপুর ও রামপালের প্রকল্প বাতিল করতে হবে।

বিজ্ঞান সম্মেলনে নাছিমা আক্তারকে সভাপতি, ওয়াসি ইসলাম অরণ্যকে সহসভাপতি, মারুফা অনন্য সেজুতিকে সাধারণ সম্পাদক ও জুয়েনা বিশ্বাস উপমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৪ সদস্য বিশিষ্ট বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চও নারায়ণগঞ্জ জেলার নতুন কমিটি পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সম্মেলনে বিজ্ঞানবিষয়ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় নগরের রাসেল পার্কে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের পক্ষ থেকে টেলিস্কোপ স্থাপন করে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়।

ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে সমাবেশ ও গণমিছিল

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেকা মিশু, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাসদ (মার্কসবাদী)র কেন্দ্রীয় নেতা রাশেদ শাহরিয়ার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ পরিচালনা করেন বাসদ নেতা খালেকুজ্জামান লিপন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসরায়েল গাজাকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কারাগার ও কসাই খানায় পরিণত করেছে। এই বন্দিদশা থেকে ফিলিস্তিনিদের বাঁচাতে দেশের ও বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বাংলাদেশে মোসাদ,

সিআইএ কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের সামনে তথ্য তুলে ধরার জোর দাবি জানান। এছাড়াও বিনা ভোটের সরকার ও ক্ষমতায় যাওয়ায় মরিয়া বিরোধীদলগুলোও ফিলিস্তিনে ইসরাইল-মার্কিন গণহত্যার বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছে। সরকার বলে সকল দেশের সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। কিন্তু দেশের সংবিধান অনুযায়ী যুদ্ধবাজ, সাম্রাজ্যবাদী-আধিপত্যবাদী দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকার কোন সুযোগ নেই।

একই দাবিতে দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় বাম গণতান্ত্রিক জোট ছাড়াও বিভিন্ন সমমনা রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক সংগঠন, যুব-ছাত্র, পেশাজীবী সংগঠনের পক্ষ থেকে সমাবেশ, মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

ঋণনির্ভর ঘাটতি বাজেট প্রত্যাখ্যান করে বাম গণতান্ত্রিক জোটের মিছিল

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট সংকটের চক্রে ঘূর্ণায়মান দিশাহীন বাজেট। অতীতের অর্থনৈতিক সংকটের কারণে চিহ্নিত করে দূর করার কোন দিক নির্দেশনা এ বাজেটে না থাকায় অর্থনীতি সংকটের চক্রেই ঘুরপাক খেতে থাকবে। এ কথাগুলো বলেছেন বাম জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রত্যাখ্যান করে দুর্নীতি-লুটপাটের বিরুদ্ধে বাম গণতান্ত্রিক জোটের পক্ষ থেকে ৮ জুন দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ৮ জুন '২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাম জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশেরাফা শিশু, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাসদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী। সমাবেশ পরিচালনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য খালেদুজ্জামান লিপন।

কমরেড ফিরোজ বলেন, সরকারের দুর্নীতি, অপচয় ও লুণ্ঠনমূলক নীতির দায় জনগণের উপর চাপিয়ে কর ও ভ্যাট বৃদ্ধির বাজেট জনজীবনে দুর্ভোগ আরও বহুগুণ বাড়াবে।



সমাবেশে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবারের বাজেটকে গতানুগতিক ও ঋণনির্ভর ঘাটতি বাজেট অখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করে গরিব মেহনতি মানুষের পক্ষে গণমুখী বাজেট প্রণয়নের আহ্বান জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ২ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি টাকার ঘাটতি বাজেটে দেশি বিদেশি ঋণের উপর নির্ভর করা হয়েছে। তাই বাজেটে ঋণের সুদ পরিশোধের জন্যই ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট বাজেটের ৭ ভাগের একভাগ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী তিন মাসেই ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। গত মার্চের শেষে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৮২ হাজার ২৯৫ কোটি টাকা, যা বিতরণ করা মোট ঋণের ১১ দশমিক ১১ শতাংশ। গত ডিসেম্বরে খেলাপি ঋণের হার ছিল ৯ শতাংশ। অর্থনীতিবিদদের মতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বাস্তবে সাড়ে ৪ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। একদিকে ঋণ খেলাপি বাড়ছে অন্যদিকে সরকার বাজেটে দেশের ব্যাংক থেকে ১ লাখ

৩৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ফলে দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্ত হবে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, টাকার অবমূল্যায়ন, মূল্যস্ফীতি ও জিডিপি বিবেচনায় নিলে বাজেটে শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কৃষি এবং সামাজিক সুরক্ষা খাতেও বরাদ্দ বাস্তবে বাড়েনি বরং কমেছে। টাকার অংকে সামাজিক সুরক্ষা খাতে ১০ হাজার কোটি টাকা বাড়ানোর প্রস্তাব করা হলেও বাস্তবে তা পেনশনভোগী, উপবৃত্তি ও মুক্তিযোদ্ধা ভাতায় চলে যাবে। উপরন্তু কৃষি খাতে ভর্তুকিতে ২৩-২৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৮ হাজার কোটি টাকা প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি খাতে বরাদ্দ কমানো হয়েছে। মুঠো ফোনে ১০০ টাকার টক টাইম পেতে এখন গ্রাহককে দিতে হবে ১৩৯ টাকা। বহুল প্রচারিত মেট্রো রেলও ভ্যাট আরোপ করা হচ্ছে। যা জনজীবনে ভোগান্তি বাড়াবে।

বাজেটে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চয়তার জন্য রেশনিং এর জন্য কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি। বাজেটে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্নীতি রোধে কোন কার্যকর দিক নির্দেশনা নাই। যেখানে আজিজ, বেনজির, আনার কাণ্ডে সরকারের দুর্নীতির ভয়াবহতা ফুটে উঠেছে সেখানে এবারও কালো টাকা সাদা করার সুযোগ রেখে দুর্নীতিকে আরো উৎসাহিত করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

জোটের নেতৃবৃন্দ ধনী, লুটপাটকারীদের স্বার্থে ঋণ নির্ভর ঘাটতি বাজেট না করে গরিব মেহনতি মানুষের স্বার্থে বাজেট প্রণয়নের দাবি জানান।

ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে গণমিছিল

সারাদেশে বাম গণতান্ত্রিক জোটের সংহতি সমাবেশ

ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধ, জাতিসংঘ সদস্যপদ থেকে বর্বার ইসরাইলকে বহিষ্কার, মার্কিন-ইসরায়েল যুদ্ধ উন্মাদনার বিরুদ্ধে ১ জুন দেশব্যাপী সংহতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।



এ উপলক্ষে ঢাকায় বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসরায়েল ফিলিস্তিনে দীর্ঘ ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গণহত্যা চালিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে যাচ্ছে। এর বেশিরভাগই শিশু-নারী উল্লেখ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, আন্তর্জাতিক আইনে শিশু-নারী, বয়স্ক মানুষ, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দূতাবাসে হামলা চালাতে পারে না। কিন্তু ইসরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদে ফিলিস্তিনে একের পর এক

হামলা ও হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে। জাতিসংঘ ফিলিস্তিনে হামলার বিষয়ে ইসরায়েলকে সতর্ক করলেও সেটাও তারা তোয়াক্কা করছে না উল্লেখ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে বর্বার ইসরায়েলকে জাতিসংঘের সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করতে হবে। পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইসরাইলের মদদদাতাদের বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান

নেতৃবৃন্দ।

১ জুন ২০২৪ বিকেল ৪ টায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে পুরানা পল্টনে আয়োজিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স। বক্তব্য রাখেন বাসদ সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবি'র সাবেক

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত



প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের এক সভা ৭ জুন '২৪ ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে অধ্যাপক আবুল কাশেম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেদুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাবেক

ও বর্তমান শিক্ষক বৃন্দ। সভায় সংগঠনের সম্মেলন কার্যক্রম বৃদ্ধি, দাবিনামা পুনর্গঠন, সদস্য সংগ্রহ ও শিক্ষকদের পেশাগত সমস্যা ও শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে কার্যক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় অধ্যাপক আবুল কাশেমকে আহ্বায়ক ও অধ্যক্ষ মোশায়েদ হোসেন ঢালীকে সদস্যসচিব করে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

ছাত্র ফ্রন্ট বাকুবি শাখার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত



কাউন্সিলে নিশাত আনজুম মিথিলাকে সভাপতি ও সজীব দাসকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি নির্বাচিত হয়

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বাকুবি শাখার ২৪তম কাউন্সিল ও কমিটি পরিচিতিসভা ৫ জুলাই টিএসসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলে বক্তব্য রাখেন ডা. শামসুল হোসেন, ডা. মনীষা চক্রবর্তী, ইমাম হোসেন খোকন ও মুক্ত বারৈ।

লেনিন ও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা : দেশে দেশে মুক্তির লড়াই

(পূর্ব প্রকাশের পর)



ভ. ই লেনিন

(জন্ম : ২২ এপ্রিল ১৮৭০; মৃত্যু : ২১ জানুয়ারি ১৯২৪)

[এ বছর ২১ জানুয়ারি রুশ বিপ্লবের নেতা এবং বিশ্ববিপ্লবের নেতা এবং বিশ্ববিপ্লবের প্রেরণা ভ. ই. লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে ৩১ জানুয়ারি '২৪ সমাজ-রূপান্তর অধ্যয়ন কেন্দ্র-এর উদ্যোগে 'লেনিন ও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা : দেশে দেশে মুক্তির লড়াই' শিরোনামে আলোচনাসভায় কমরেড খালেকুজ্জামানের প্রদত্ত বক্তব্য ভ্যানগার্ডে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে। এ সংখ্যায় শেষ কিস্তি। সম্পাদক]

কমরেড মাও পরবর্তী প্রত্যেকেই মাওয়ের লাইনের বিরুদ্ধে হাটলেও, মাওয়ের চিন্তাকে অন্যতম গাইড-লাইন হিসাবে উল্লেখ করতে হচ্ছে, কারণ নিশ্চিতভাবেই দলের অভ্যন্তরে মাওয়ের সমাজতন্ত্রের চিন্তার অনুসারীরাও উল্লেখযোগ্য শক্তি নিয়ে আছে। এই কারণে, পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলো বা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পতনের পরই যেভাবে কোন প্রতিরোধ ছাড়াই লেনিন স্ট্যালিনের মূর্তি ভেঙে ফেলতে পেরেছে, নিজেরাই ঘোষণা করে কমিউনিস্ট পার্টিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে এবং কোথাও নিষিদ্ধ পর্যন্ত করেছে চীনের ক্ষেত্রে দেং জিয়াও পিং-এর নানা রকম প্ররোচনা সত্ত্বেও তেমনভাবে কমরেড মাও-কে অপসারিত করা সম্ভব হয়নি। চীনের দলের অভ্যন্তরের বিরোধ চীনকে আবার সমাজতন্ত্রের পথে আনতে পারবে কিনা তা চূড়ান্তভাবে বুঝতে পারার জন্য হয়ত আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, তবে চীনের অর্থনীতি এবং বাজার যে এখন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদী বাজারের অংশ তাতে কোন সন্দেহ নাই।

তাহলে, একদিকে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতন, অন্যদিকে অবাধ বাণিজ্যের নামে শুষ্কহীন অথবা নামমাত্র শুষ্ক পণ্য রপ্তানি, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বাধাহীন অধিকার প্রতিষ্ঠা, লগ্নি-পুঁজির সহজ চলাচলের সুযোগ, চীনের বিরাট বাজারে প্রবেশের সুযোগ ইত্যাদির কারণে বাজারের আপেক্ষিক সম্প্রসারণ এবং সর্বোপরি ইন্টারনেট পরিষেবার মতো বিপুলায়তনের নতুন বাণিজ্য ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া সব মিলিয়ে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় আশার সঞ্চার ঘটে। তথাকথিত উদার অর্থনীতির প্রবক্তারা মনে করতে শুরু করেন যে মার্কস পুঁজিবাদের জন্মগত যে সংকটের কথা বলেছিলেন সেটা শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে ওঠা গেছে এবং পুঁজির অবাধ চলাচলের ব্যবস্থা করে ফেলায় বাজার নিয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের অবসান করা গেছে। কিন্তু তাদের এই বিশ্বাস ভেঙে পড়ার জন্য খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ২০০৮ সালেই ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট ভেঙে পড়াকে কেন্দ্র করে

সর্বগ্রাসী মন্দা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী বাণিজ্য ও অর্থনীতি ব্যবস্থার ভঙ্গুরতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

গত শতাব্দীর সূচনায় যখন মনোপলি ক্যাপিটাল মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে তখন সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেনিন, ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে, একটি প্রবন্ধে লগ্নি-পুঁজির কয়েকটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব উল্লেখ করেছিলেন। দেখিয়েছিলেন লগ্নি পুঁজি খুবই সঞ্চরণশীল (mobile) এবং নমনীয় (flexible), লগ্নি-পুঁজি ঘরে এবং আন্তর্জাতিকভাবে আন্তঃসম্পর্কিত, চরিত্রের দিক থেকে বিশেষভাবে নৈব্যক্তিক এবং যথার্থ উৎপাদন বলতে যা বোঝায় (real sector) তা থেকে সংযোগহীন; খুব সহজেই কেন্দ্রীভূত হয় এবং লেনিন এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে, ইতিমধ্যেই সেটি অস্বাভাবিক মাত্রায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে, যাকে আক্ষরিক অর্থেই কয়েকশ বহুকোটির মালিক এবং কোটিপতি (a few hundred multimillionaires and millionaires) বিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে বলা চলে। দেখা যাচ্ছিল যে এটা এমন একটা সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে যে উদ্যোগ সংস্থাগুলোর পরিবর্তে উদ্যোগপতিদের একচেটিয়া অ্যাসোসিয়েশন বা ট্রাস্ট স্বদেশে তো বটেই, এমন কি বিদেশের ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে- 'অবাধে' একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। যেন, লগ্নি পুঁজিই বিশ্বের টিপিক্যাল 'প্রভু' হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছে।

লগ্নি-পুঁজির ক্রম প্রসারিত এই চরিত্র দেখে কাউটস্কি অদ্ভুত এক সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কাউটস্কির সেই ধারণা সম্পর্কে লেনিন লেখেন, 'বিমূর্ত তাত্ত্বিক যুক্তি এই উপসংহারে নিয়ে যেতে পারে যেমন, কিছুটা ভিন্ন চঙে কিন্তু মার্কসবাদকে পরিত্যাগ করার মাধ্যমে কার্ল কাউটস্কি এসেছেন- যে সেই সময় আর খুব বেশি দূরে নয় যখন পুঁজির এই বৃহদাকার চাঁইরা বিশ্বস্তরে একটি একক বিশ্ব-ট্রাস্টে একত্রিত হবে এবং জাতীয় স্তরে বিচ্ছিন্ন লগ্নী-পুঁজির সমষ্টির মধ্যে যে প্রতিযোগিতা এবং সংগ্রাম তাকে আন্তর্জাতিকভাবে একাবদ্ধ লগ্নী-পুঁজি দিয়ে প্রতিস্থাপন করবে।' এমন বিভ্রান্তি থেকেই কাউটস্কি সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এমন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে সুবিধাবাদের জন্ম দিয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছিল। লেনিন লিখেছেন, 'কাউটস্কি বিপ্লবী মার্কসবাদীদের বিরোধিতা করে তার "অতি-সাম্রাজ্যবাদ"-এর নতুন তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। এর দ্বারা তিনি বোঝাচ্ছেন যে "জাতীয় লগ্নি পুঁজিগুলির বৈরিতা" (rivalries of national finance capitals) "আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজির যৌথভাবে বিশ্বের শোষণ" (joint exploitation of the world by international finance capital)-এর মাধ্যমে দূর করা হবে।'

ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নির্দিষ্টায় বলা যায় যে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র সম্পর্কে লেনিন যে যে কথা বলেছিলেন তার সবগুলি আজকের দিনেও প্রকট হয়ে উঠেছে। যদিও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া, পুঁজির সচলতা অপেক্ষাকৃত সহজ হওয়া, একই ছাদের তলায় পণ্যের সম্পূর্ণ অ্যাসেম্বলি লাইন রাখার বাধ্যবাধকতা দূর হওয়া ইত্যাদি কারণে পণ্যের উৎপাদন এবং বাজারজাত করার প্রক্রিয়ায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পতন ও সমসাময়িক বিশ্ববাণিজ্যের সাময়িক সম্প্রসারণ দেখে অনেকেরই কাউটস্কির ব্যাখ্যা সঠিক বলে মনে হতে শুরু করেছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন লগ্নি-পুঁজির জাতি-রাষ্ট্রের পরিচয় মুছে গেছে এবং সেই কারণে সাম্রাজ্যবাদীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আর আগের মতো নেই। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের

নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের যে অবসান ঘটতে পারে না তা প্রমাণ করতেই একমেরু বিশ্ব-ব্যবস্থা তৈরি করার স্বপ্ন ভেঙ্গে খানখান হয়ে গিয়ে এখন চারিদিকে বিভিন্ন শক্তিগুলো নিজেদের স্বার্থানুসারে দুইজোটভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে, মেরুকরণ প্রক্রিয়া তীব্র সাংঘর্ষিক হয়ে উঠছে। যদিও মার্কসবাদের দ্বন্দ্বিক ব্যাখ্যাকে সঠিক প্রমাণ করতেই সেই জোটের মধ্যেও দ্বন্দ্ব প্রকাশ পাচ্ছে। চীন-রাশিয়ার সাথে স্বার্থের দ্বন্দ্ব যখন ইউএস, জাপান, ভারত-অস্ট্রেলিয়া মিলে কোথাও জোট গঠন করে, তো পরমুহূর্তেই অন্য কোন স্বার্থে চীন-ভারত, রাশিয়া এক কাতারে আমেরিকার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। লেনিন বলেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি থাকলেই যুদ্ধ থাকবে, যুদ্ধের অস্তিত্ব থাকবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর একটা দিনও পৃথিবী দেখিনি যখন কোথাও না কোথাও স্থানীয় যুদ্ধ নেই। কত কত দেশের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, যুদ্ধের সাথে যাঁরা কোনভাবেই লিপ্ত নয়, নিহত হয়েছেন। ঘর-বাড়ি, সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে।

মার্কস পুঁজিবাদী অর্থনীতির যে বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছিলেন লেনিন তাকে ভিত্তি করেই বিপ্লব ও বিপ্লব পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনের রূপরেখা নির্মাণ করেছিলেন। মার্কসের সেই সব বিশ্লেষণ—উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব, মুনাফার তত্ত্ব, শ্রমশক্তির শোষণ এবং শোষণের হারের তত্ত্ব, পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত অবশ্যম্ভাবি অর্থনৈতিক সংকটের তত্ত্ব ইত্যাদি—সেগুলি সব কি বাতিল হয়ে গেছে? যদি না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আজকের বাস্তবতাতে যে লড়াই সংগ্রাম আমাদের গড়ে তুলতে হবে সেখানে লেনিনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে কোন মতেই অস্বীকার করা যাবে না। পুঁজিবাদী যুগের অবাধ ও মুক্ত প্রতিযোগিতা সম্পর্কে অনেক গালভরা দার্শনিক কথা বলা হয়েছে। আজও বলা হয়। বলা হয়েছিল, অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুঁজিবাদ আসলে সমস্ত মানুষের সমান সুযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এর চেয়ে অবাস্তব দর্শন আর হতে পারে না। যখন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ ছিল, তখনও এই কথা সকল মানুষের জন্য সত্য ছিল না, আজ তো কথাই নেই। পুঁজির মালিকের সাথে, বিভ্রাটালীর সাথে হতদরিদ্র শ্রমিকের, নিরন্ন মানুষের অবাধ ও মুক্ত প্রতিযোগিতার কথা বলা হাস্যকর। যতই অবাধ ও মুক্ত প্রতিযোগিতাকে মানুষের জন্য কল্যাণকর বলে মহিমামণ্ডিত করার চেষ্টা করুক উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বুর্জোয়া দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদরা, অবাধ ও মুক্ত প্রতিযোগিতা পুঁজিপতিদের জন্যও কোন চূড়ান্ত অবস্থা ছিল না। পুঁজিবাদের বিকাশের পথেই যে একচেটিয়া পুঁজি আসবে সে কথা মার্কস বলেছিলেন। ইতিহাস সেই কথাকে সত্য প্রমাণিত করেছে। আজ কোথাও মুক্ত ও অবাধ প্রতিযোগিতার ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না—না বাণিজ্যে না সমাজজীবনে। আয়-বণ্টন, সম্পদ বণ্টনে বিপুল বৈষম্যের সৃষ্টি, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে সমাজের সমস্ত সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া পুঁজিবাদের আসল চেহারা আজকের দিনে প্রকট করে তুলেছে।

মার্কস স্টক মার্কেটের আধুনিক চেহারা দেখে যাননি, কেবলমাত্র তার প্রারম্ভিক সূচনা দেখেছিলেন। পুঁজি গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড সম্পাদনাকালে এঙ্গেলস মার্কসের স্টক মার্কেট সম্পর্কে ভাবনাকে বিস্তৃত করে একটি প্যারাগ্রাফ জুড়ে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'মার্কস এই কথা লেখার পর থেকে শিল্পোদ্যোগের নতুন নতুন রূপের বিকাশ ঘটেছে, আমরা যাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাত্রার স্টক মার্কেটের প্রতিনিধি বলে জানি। বর্তমানে বৃহদায়তন উৎপাদনের সমস্ত ক্ষেত্রে

দৈনিক উৎপাদন যে ক্রমবর্ধমান গতিতে প্রসার ঘটানো সম্ভব তা উৎপাদিত অতিরিক্ত দ্রব্যসামগ্রীর বাজার সম্প্রসারণের হার যেভাবে ক্রমাগত মন্থর হয়ে আসে তার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। বৃহদায়তন উৎপাদন এক মাসে যা উৎপাদন করে, বাজারে তা বিক্রি হতে লাগে কয়েক বছর। এর সাথে যোগ করুন সংরক্ষণমূলক শুষ্ক-নীতি, যার সাহায্যে প্রত্যেকটি শিল্পোন্নত দেশ অন্য দেশের থেকে, বিশেষত ইংল্যান্ড থেকে, নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। তা ছাড়া প্রত্যেকেই নিজেদের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতাও কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি করে। ফলাফল দাঁড়ায় সাধারণ দীর্ঘস্থায়ী অতি-উৎপাদন (a general chronic overproduction), দাম কমে যাওয়া, মুনাফার পতন অথবা সম্পূর্ণ উবে যাওয়া। সংক্ষেপে, পূর্বের গর্বের সাথে ঘোষিত প্রতিযোগিতার স্বাধীনতা উপনীত হয়েছে তার শেষ সীমায় এবং অবশ্যম্ভাবি কলঙ্কজনক দেউলিয়াপনা অবশ্যই নিজেই প্রকট হয়ে উঠছে। এবং প্রত্যেক দেশেই যা ঘটছে তা হলো একেকটি বিশেষ শাখার বৃহৎ শিল্পপতির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য 'কার্টেল'-এ যোগ দিচ্ছেন। একটি কমিটি ঠিক করে দেয় প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কী পরিমাণ উৎপাদন করবে এবং যে অর্ডারগুলি আসে তা বন্টন করে দেওয়ার জন্য এই কমিটিই চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। কখনো কখনো আন্তর্জাতিক 'কার্টেল'-ও তৈরি হচ্ছে, যেমন হয়েছে জার্মানি ও ইংল্যান্ডের লৌহ শিল্পের মধ্যে। কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ধরনের সমিতি প্রতিষ্ঠা করাও যথেষ্ট হলো না। সমিতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার বৈরিতা খুবই ঘন ঘন ফেটে পড়ে এবং তার ফলে আবার প্রতিযোগিতা ফিরে আসে। এর পরিণতি হিসাবে কোন কোন শাখায়, উৎপাদনের পরিমাণের কারণে যেখানে যেখানে সম্ভব, সেই শিল্প শাখার সমগ্র উৎপাদন একটি একক পরিচালনাধীন যৌথ-মূলধনী কোম্পানিতে কেন্দ্রীকরণ। আমেরিকায় এটা বারংবার কার্যকর হয়েছে; ইউরোপে এ পর্যন্ত বৃহত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'ইউনাইটেড অ্যালকালি ট্রাস্ট' যা ব্রিটেনের সমগ্র অ্যালকালি উৎপাদনকে একটি মাত্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের হাতে নিয়ে এসেছে। ...অতএব, ইংল্যান্ডে সমগ্র রসায়ন শিল্পের ভিত্তিস্বরূপ এই শাখাটিতে প্রতিযোগিতার স্থান গ্রহণ করেছে একচেটিয়া কারবার...।' (মার্কস-এঙ্গেলস রচনাসংগ্রহ-৩৭, পৃ-৪৩৫)

উপরের এই কথা পড়ে কারোর মনে কি সামান্যতম সন্দেহ থাকতে পারে যে, প্রায় দেড়শ বছর আগে পুঁজিবাদের যে চেহারা মার্কস-এঙ্গেলস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন আজকের চেহারা তারই বাস্তব প্রতিফলন নয়? বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ইত্যাদি নানা কসরৎ করেও কি পুঁজিবাদের এই সংকটজনক অবস্থা থেকে মুক্তি মিলেছে? এঙ্গেলস বলেছিলেন যে আন্তঃদেশীয় শুষ্ক প্রাচীর তৈরি করে প্রত্যেকটি দেশ নিজের আভ্যন্তরীণ বাজারকে সংরক্ষিত রাখতে চায়, কিন্তু এই কারণে প্রত্যেক দেশেরই বাজার সংকুচিত হয় এবং অতি-উৎপাদনের সংকট বরং বৃদ্ধি পায়। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে কোন একক বাণিজ্য শাখায় আন্তর্জাতিক কার্টেল করে সমঝোতা করার চেষ্টা করলেও, এঙ্গেলস বলেছিলেন খুব ঘন ঘনই সেই সমঝোতা ভেঙে পড়ে এবং ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতা আবার ফিরে আসে। এই শুষ্ক প্রাচীর অপসারণ করে দেশে দেশে পণ্যের এবং পুঁজির অবাধ চলাচলের মাধ্যমে বাণিজ্য প্রসারের প্রচেষ্টার নামই বিশ্বায়ন। কিন্তু দেখা গেল বিশ্বায়নের মধ্যদিয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলোর মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছিল, ইতিমধ্যেই তা ভেঙে পড়ে অনেক ক্ষেত্রেই আবার পুরনো প্রতিযোগিতা ফিরে এসেছে, আবার এক এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

লেনিন ও বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা : দেশে দেশে মুক্তির লড়াই

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

দেশ আরেক দেশের উপর আমদানি শুদ্ধ চাপাচ্ছে, ঠিক এঙ্গেলস আন্তর্জাতিক কার্টেলের ক্ষেত্রে যেমনটি বলেছিলেন। তাহলে, কোনভাবেই বাজার সম্প্রসারণ করে অতি-উৎপাদনের সমস্যা এবং তার থেকে উদ্ধৃত সংকট থেকে পুঁজিবাদের রেহাই মিলছে না। বরং একটার পর একটা নিত্যনতুন সংকট সাধারণ মানুষের জীবনকে করে তুলেছে দুঃসহ। সব দেশেরই পুঁজির গরিষ্ঠ অংশ সম্পদ-সৃষ্টির সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফটকা বাজারে ফটকা-পুঁজিতে-মার্কসের ভাষায় fictitious capital-পরিণত হয়ে চলেছে। মার্কস স্টক-মার্কেটের জগাবস্থাতেই বলেছিলেন, ‘এটি নতুন আর্থিক অভিজাততন্ত্রকে পুনরায় জন্ম দিয়েছে; প্রযোজক (promoter), ফটকাবাজ এবং কেবল নামেমাত্র পরিচালকের (nominal directors) বেশে এক নতুন ধরনের পরজীবী; কর্পোরেশনের উদ্যোক্তা হওয়া, শেয়ার ইস্যু করা এবং শেয়ারের ফটকাবাজি করার মাধ্যমে জুয়াচুরি ও প্রতারণার একটি সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। এটি ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই ব্যক্তিগত উৎপাদন।’ (মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলি-৩৭, পৃ-৪৩৬)

গোটা বিশ্বের দেশে দেশে অর্থনীতি বর্তমানে এই ফটকা পুঁজির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, যা মার্কসের সেদিনের বিশ্লেষণ এবং পরবর্তী সময়ে লেনিনের ব্যাখ্যাকে যথার্থ বলেই প্রতিপন্ন করে।

মার্কসবাদ ব্যাখ্যা করে বলেছিল মুক্ত ও অবাধ প্রতিযোগিতা প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থায় নৈরাজ্যের জন্ম দেয়, যে নৈরাজ্য সংকট ডেকে আনে যার কারণে সামাজিক সম্পদের অপচয় হয় এবং শ্রমিকশ্রেণি তথা সাধারণ মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। এখন থেকে প্রায় ১৭৫ বছর আগে, যখন *কমিউনিস্ট ইশতেহার*ও লেখা হয়নি, মার্কসবাদ পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি, উদ্ভূত মূল্যের তত্ত্ব মার্কস তখনও আবিষ্কার করেননি, তখন এঙ্গেলস যেভাবে পুঁজিবাদের সংকটের চেহারা বর্ণনা করেছিলেন তা বর্তমান কালের হুবহু চিত্রায়ন। তিনি লিখেছিলেন, ‘এইভাবে উৎপাদনের সুবিধার সাথে সাথে মুক্ত প্রতিযোগিতা, বড় শিল্পের সাথে যা আবশ্যিকভাবে আবদ্ধ, সবচেয়ে চরম রূপ ধারণ করে; বিপুল সংখ্যক পুঁজিপতির শিল্পে আগমণ ঘটে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই যা প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি উৎপাদিত হয়। ফলস্বরূপ, সমস্ত তৈরি-পণ্য বিক্রি হয় না এবং একটা তথাকথিত বাণিজ্যিক সংকট শুরু হয়। মালিকরা কারখানাগুলি বন্ধ করতে বাধ্য হয় ও দেউলিয়া হয়ে পড়ে এবং শ্রমিকদের অনাহার শুরু হয়। সর্বত্র চরম দুর্দশা নেমে আসে। কিছু সময়ের পরে, অতিরিক্ত পণ্যগুলি বিক্রি হয়, আবার কারখানা খুলতে শুরু করে, মজুরি বাড়ে এবং ধীরে ধীরে ব্যবসা আগের চেয়ে আরও ভালো হয়। তবে তা খুব বেশিদিনের জন্য স্থায়ী হয় না, আবার অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদিত হয় এবং নতুন করে সংকট শুরু হয়, আবার পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে।’ (মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলি-৬, পৃ-৩৪৭)

এই পর্যায়ক্রমিক সংকটের আবর্তের চেহারা থেকে কি পুঁজিবাদ মুক্তি পেয়েছে? পায়নি, পাওয়া সম্ভব নয়। জন্মলগ্ন থেকেই পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত চরিত্র হলো পণ্য উৎপাদনে ভারসাম্যহীনতা এবং তার থেকে আসে বাজারের সংকট, বাণিজ্যে মন্দা এবং অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে বিপর্যয়। মন্দার কবলে অনাহারে শ্রমিক ও সাধারণ গরিব মানুষের মৃত্যুর পাশাপাশি যে সমস্ত কল-কারখানা ধ্বংস হয়, যন্ত্র ও অন্যান্য উৎপাদনের সরঞ্জাম বিনষ্ট হয় সেগুলো কিন্তু সামাজিক শ্রমের বিনিময়ে গড়ে ওঠা সম্পদ। সামাজিক শ্রমের বিনিময়ে কীভাবে পুঁজিবাদের উৎপাদিকা শক্তি গড়ে ওঠে তার তথ্য ও বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে

কার্ল মার্কসের পুঁজি গ্রন্থে। মাত্রাহীন অর্থলিঙ্গার কারণে কীভাবে শিল্প-বিকাশের প্রথম যুগে শ্রমিকের প্রাণ গিয়েছে সেই কথাও উল্লেখ আছে মার্কসের *দাস ক্যাপিটাল*-এ। কার্ল মার্কস সরকারি রিপোর্ট উল্লেখ করে বলেছেন, ‘১৮৬০ সাল নাগাদ ইংল্যান্ডের কয়লাখনিগুলিতে সপ্তাহে গড়ে ১৫ জন মানুষ প্রাণ হারাত। কয়লাখনির দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে একটি রিপোর্ট (ফেব্রুয়ারি ৬, ১৮৬২) অনুসারে ১৮৫২ থেকে ৬১ এই দশ বছরে নিহত হয়েছিল ৮,৪৬৬ জন। কিন্তু রিপোর্টেই স্বীকার করা হয়েছে যে, এই সংখ্যাটা খুবই কম, কেননা প্রথম কয়েক বছরে, যখন সবেমাত্র পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তাদের দেখভালের এলাকাগুলো ছিল অতি বিশাল, তখন দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর বড় অংশের হিসাব রিপোর্টে আসেনি। দুর্ঘটনার সংখ্যা, যদিও এখনো অনেক বেশি, তবে ঘটনা এই যে পরিদর্শন-ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে এই সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কমে এসেছে। এটা ঘটেছে অপরিপূর্ণ সংখ্যক পরিদর্শক এবং তাদের সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও। এই ঘটনা পুঁজিবাদী শোষণের স্বাভাবিক প্রবণতাকে উন্মোচন করে। এই সমস্ত মানুষের মৃত্যুর কারণ হলো খনি-মালিকদের মাত্রাহীন অর্থ লিঙ্গা।’ (মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলি-৩৭, পৃ-৯১)

মার্কসের এই কথা লিখে যাওয়ার প্রায় দেড় শতাব্দী পরেও কি চেহারার পরিবর্তন হয়েছে? আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা কি বলে? ২০১২ সালে আশুলিয়ায় তাজরীন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে আশুন লেগে প্রায় ১১৭ জন শ্রমিক প্রাণ হারালো। তার কিছুদিন পরেই রানা প্লাজায় প্রায় ১২০০ শ্রমিকের প্রাণ চলে গেলো, আহত হয় অসংখ্য। কিছুকাল আগে একটা গার্মেন্টস কারখানার বয়লার বিস্ফোরণের কারণে প্রায় ১৫ জন শ্রমিকের প্রাণ গেল। সেজান জুস কারখানায় ৪৫ জন শ্রমিককে পুড়ে মরতে হল। প্রতি বছর এমন হয়েই চলেছে শ্রমিকের অকারণে, অনভিপ্রেত, অপ্রয়োজনীয় মৃত্যু। পুঁজিপতিদের মাত্রাহীন অর্থ লিঙ্গার জন্য শ্রমিকের মৃত্যুর কথা বাদ দিলেও, এই কথা সত্য যে খনিজ সম্পদ আহরণের মতো অন্যান্য সমস্ত শিল্প-ব্যবস্থাই আকাশ থেকে আসেনি বা কোন মালিক নিজের শ্রমে গড়ে তোলেনি। অর্থাৎ সামাজিক শ্রমের মধ্য দিয়েই সমাজের উৎপাদিকা শক্তি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এই অবস্থা ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, অন্যান্য দেশের পুঁজিবাদী উৎপাদিকা শক্তি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও সত্য। এই কথা খনি শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সত্য। এই কথা কায়িক শ্রম-শক্তির ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের জন্য মেধা-শ্রমের ক্ষেত্রেও সত্য। অর্থাৎ আজকে বিশ্বের সর্বত্র এবং আমাদের দেশেও খনি-কল, কারখানা-যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ফলে উৎপাদনের যে বিপুল আয়োজন দেখি তার সবকিছুই সামাজিক শ্রমের ফসল, কিন্তু সেই সামাজিক সম্পদের উপর মালিকানার অধিকার ব্যক্তিগত। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বজায় থাকলে তার অন্তর্নিহিত ভারসাম্যহীনতার জন্যই এই সামাজিক সম্পদের অপচয় ঘটে। এই কারণে *দাস ক্যাপিটাল*-এ মার্কস বলেছেন, ‘পুঁজিবাদী উৎপাদন, যদি সম্বলন প্রক্রিয়া এবং অতিরিক্ত মাত্রার প্রতিযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিবেচনা করা যায়, তবে দেখা যাবে পণ্যের মধ্যে বস্তুরূপে মূর্ত শ্রম (materialised labour objectified in commodities) ব্যবহারে অত্যন্ত মিতব্যয়ী। তবু, অন্য যে কোন উৎপাদন পদ্ধতির তুলনায়, এই পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে মানুষের জীবনের, কিংবা জীবন্ত শ্রমের-কেবল রক্ত-মাংসের নয়, স্নায়ু ও মস্তিষ্কেরও-অপব্যয় করে।’ (মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলি-৩৭, পৃ.-৯২)

এইভাবে নিয়োজিত সামাজিক শ্রমশক্তি,

রক্ত, ঘাম ও মেধায় সম্পদ গড়ে ওঠে। সেই সামাজিক প্রক্রিয়ায় পুঁজিও গড়ে ওঠে। কিন্তু, সেই পুঁজিও অন্য অনেক মানুষের অপরিশোধিত শ্রমের (unpaid labour) ঘনীভূত রূপ যার উপর ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। মার্কস পুঁজি গ্রন্থে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন, ‘পুঁজি, সুতরাং, অ্যাডাম স্মিথ যেমন বলেছেন, তেমনি শুধুমাত্র শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ নয়। এটি মূলত অপরিশোধিত শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ। সমস্ত উদ্ভূত মূল্য, নির্দিষ্ট রূপ যেমনই হোক না কেন (লাভ, সুদ, বা খাজনা), পরবর্তীকালে এটি যে কোন আকারে দানা বাঁধতে পারে, মূলত অপরিশোধিত শ্রমের বস্তুরূপধারণ (materialisation of unpaid labour)। পুঁজির স্ব-প্রসারণের গোপন রহস্য আত্ম-প্রকাশ করে অন্য ব্যক্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ অপরিশোধিত শ্রমের উপর নিজের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।’ (মার্কস-এঙ্গেলস রচনাবলি-৩৫, পৃ.-৫৩৪)। সেই সামাজিক সম্পদের অপচয় রোধ করা সম্ভব যদি অর্থনীতিতে নৈরাজ্যবাদ দূর করা সম্ভব হয়। যে নৈরাজ্যের মূল কারণ হলো সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার, কারণ ব্যক্তি মালিক তাঁর সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের আশায় পুঁজি নিয়ে ছুটে বেড়ায় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। সামাজিক কল্যাণের প্রতি তাঁর কোন দায়বদ্ধতা নেই। সার্বিক অর্থনীতির (macro-economy) গড় মুনাফার তুলনায় কম মুনাফায় সে কখনো সন্তুষ্ট থাকে না, থাকতে পারে না। এখান থেকেই পুঁজি পরিকল্পনাহীন, সামাজিক দায়িত্বহীন নৈরাজ্যের জন্ম দেয়। সেই নৈরাজ্য দূর করা যাবে কীভাবে? এই প্রশ্ন লেনিনের সামনেও ছিল, আমাদের সামনেও আছে।

তবে, তথাকথিত বুর্জোয়া সংসদীয় পথে যে সেটা সম্ভব হবে না, তা নিশ্চিত। কোন দেশেই তা সে আমেরিকা হোক, ভারত হোক বা আমাদের বাংলাদেশ হোক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আড়ম্বর থাকলেও সংসদে আদতে প্রকৃত বিরোধী শক্তি বলে কিছু নেই বা থাকে না। ভোট করতে দেয় না বলে নেই, তা নয়। ভোট করতে দিলেও নেই, না দিলেও নেই। ধরুন, আমেরিকার দুই দল, রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট, তাদের মধ্যে ধুমুকার মারামারি লেগেই আছে। এবার দুই দলের কাছেই জানতে চান তো যে, ১. আমেরিকার ৯৯ ভাগ বনাম ১ ভাগ আন্দোলন সম্পর্কে আপনার কী মত? তা কতখানি যৌক্তিক বা অযৌক্তিক? ২. গাজায় যে ইসরায়েলী গণহত্যা চলছে তা নিয়ে আপনার কী মত? ৩. সারা দুনিয়ায় মিথ্যা অভিযোগে অভিযান চালিয়ে আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া ইত্যাদি দেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো রাষ্ট্র তা নিয়ে আপনার কী মত? ৪. সামরিক খাতে এত ব্যয় নিয়ে আপনার যৌক্তিক ব্যাখ্যা কী? ৫. সাম্প্রতিক সময়ে ‘black lives matter’ আন্দোলন সম্পর্কে আপনার মত কী? দেখবেন এই দুই দলের মতের কোন ভিন্নতা নেই, অথবা এইসব নিয়ে তারা আদৌ ভাবিত নয়। তেমনি আমাদের দেশেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধী নেত্রী খালেদা জিয়াকে আমাদের দেশের শোষণ-বঞ্চনা, লুটপাট, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অনাহার-দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কর্মহীনতা ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও দেখা যাবে তাদের অবস্থানের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। যে পার্টি যখন বিরোধী আসনে সে তখন সংসদীয় বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করে মাত্র সবাই Electoral opposition only, তাদের উভয়ের নীতিগত অবস্থান শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির পক্ষে। এটাই উদারনৈতিক বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং এই কারণে সংসদ ভালো চলল না খারাপ চলল তা নিয়ে বুর্জোয়াদের কোন মাথাব্যথা নেই। কারণ তাদের কোন বিপদ সেখানে নেই।

বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার সারমর্ম বুঝাতে গিয়ে লেনিন মার্কসের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন,

‘মার্কস পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের এই সারমর্মটি চমৎকারভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যখন, কমিউনের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, নিপীড়িতদের প্রতি কয়েক বছরে একবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় যে নিপীড়ক শ্রেণির কোন বিশেষ প্রতিনিধিরা সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদের দমন করবে!’ (লেনিন রচনাবলি-২৫, পৃ.- ৪৬৬) কিন্তু পুঁজিবাদের সংকট এত গভীর যে, এখন পৃথিবীর অনেক দেশের অভিজ্ঞতাই বলছে যে, বুর্জোয়ারা আজ আর অনুমোদন নেয়ার জন্য জনগণের উপর সেই দায়িত্ব ছেড়ে দিতেও সাহস পাচ্ছে না। যেমন, আমাদের দেশেই গত তিনটি নির্বাচনেই সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়নি। আফ্রিকার সাম্প্রতিক সময়ের কথা বিবেচনা করলে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়। যেমন, গ্যাবনে বোঙ্গোর পরিবার প্রায় ৫৬ বছর ধরে রাজত্ব করছে। কয়েক মাস আগে এক প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে যে, বোঙ্গো প্রায় ৬৪ শতাংশ ভোট পেয়ে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু জনগণ এই ঘোষণায় ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নেমে আসে এবং সেই সুযোগে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। গ্যাবনের রাজধানী লিব্রেভিলের রাস্তায় সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ উদ্‌যাপন করেছে শত শত মানুষ। গ্যাবন ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ, এখনো সেখানে প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শাসকের সেনা মোতায়েন রয়েছে। নাইজারের অবস্থাও একই, সেখানে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। সামরিক কর্মকর্তারা মালি, গিনি, বুর্কিনা ফাসো এবং চাদেও ক্ষমতা দখল করেছে। সব জায়গাতেই বিদেশি নানা শক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে জনগণের ভোটে সরকার নির্বাচিত হয়ে আসেনি।

যাই হোক, নৈরাজ্য দূর করা, শ্রম-শোষণ দূর করা সম্ভব যদি উৎপাদনের হাতিয়ারের উপর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়, যদি উৎপাদনকে সামগ্রিক পরিকল্পনার আওতায় আনা সম্ভব হয়। তাহলে এবং একমাত্র সেই পথেই, আর্থিক সমাজ-ব্যবস্থা থেকে নৈরাজ্য দূর করা সম্ভব, অপচয় দূর করা সম্ভব। তবে তার জন্য আমাদের বিপ্লবের মাধ্যমে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া অন্য উপায় নেই। আর বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় বিপ্লবের পরিকল্পনা আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে করতে হবে এবং তার জন্যও লেনিনের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা আমাদের পথ দেখাবে। তাই আসুন, সকল বাম প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি মিলিতভাবে সন্মুখ পথে চলি, বামপন্থিরা নিশানা ঠিক করি, বিপ্লবীরা সাম্রাজ্যবাদের কালো ছায়া দূর করে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের শপথে এগিয়ে চলি। মৃত্যুর একশত বছর পরেও লেনিনের শিক্ষা আমাদের পথ দেখাবে শক্তি জোগাবে।

জয় সমাজতন্ত্র, জয় সর্বহারা শ্রমজীবী জনতার জয়। কমরেড লেনিন লাল সালাম।

সহায়ক সূত্র :

১. কমরেড লেনিনের সব উদ্ধৃতির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে Collected Works, Progress Publishers, Moscow, 1960-এর সংস্করণ।

২. কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলসের সব উদ্ধৃতির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে Collected Works, Lawrence & Wishart Ltd., London, International Publishers Co. Inc., New York (Old Edition), অন্যথায় ২০১০-এর সংস্করণ।

৩. Karl Marx (1973) Grundrisse, Penguin Books (Digital version 2015)

৪. কার্ল মার্কস-এঙ্গেলস (১৯৭৫), কমিউনিস্ট ইশতেহার, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো

কমরেড জাহেদুল হক মিলুর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত



বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড জাহেদুল হক মিলুর ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ১৩ জুন সেগুনবাগিচাস্থ ভ্যানগার্ড কার্যালয়ে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাস, সদস্য জুলফিকার আলী, শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ওসমান আলী, সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলা সদস্যসচিব আবু নাসিম খান বিপ্লব, রিকশা-ভ্যান, ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি খালেদুজ্জামান লিপন, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহসভাপতি শাহজাহান কবীর, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের দপ্তর সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র

ফ্রন্টের সভাপতি মুজা বাড়ে প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কমরেড জাহেদুল হক মিলু পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে একটি শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে আজীবন লড়াই করে গেছেন। তিনি স্কুল ছাত্র থাকা কালে অনুষ্ঠিত '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন দেশের বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক জনগণের উপর শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই জারি রেখেছিলেন। মুক্তিকামী মানুষকে এই সংগ্রামে যুক্ত করেন। সেজন্য তিন বারে প্রায় ৪ বছর জেল খাটতে হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তিনি নিজেকে অমৃত্যু যুক্ত রেখেছেন। শুধু তাই নয়, পুঁজিবাদী-ভোগবাদী সংস্কৃতি ও মৌলবাদী সংস্কৃতির আধিপত্যের কবল থেকে তরণ-যুব সমাজকে রক্ষা করার জন্য তিনি সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আজীবন বিপ্লবী কমরেড মিলু ব্যক্তিগতভাবে ধন সম্পদ অর্জনের দিকে না এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নারায়ণগঞ্জে বিজ্ঞান সম্মেলন শীতলক্ষ্যা-বুড়িগঙ্গা দূষণমুক্ত করার আহ্বান উন্নয়নের নামে পরিবেশ বিধ্বংসী প্রকল্প বাতিল কর

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে বিজ্ঞান সম্মেলন ৫ জুন আলী আহমেদ চুনকা পাঠাগার ও মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সকালে চুনকা পাঠাগার চত্বরে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর অসিত বরণ বিশ্বাস। উদ্বোধনের পরে একটি বর্ণাঢ্যর্যালি শহর প্রদক্ষিণ করে। ১২ টায় চুনকা পাঠাগার মিলনায়তনে 'পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ, ফলাফল ও করণীয়'-শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন। বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ জেলার সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলার সদস্যসচিব আবু নাসিম খান বিপ্লব, মিছির আলী ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক সনজিত কুমার সেন, জেলার সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক ধীমান সাহা জুয়েল, নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুল ও কলেজের সিনিয়র শিক্ষক শ্রীকান্ত চন্দ্র নন্দী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক সুলতানা আক্তার, বিজ্ঞান

আন্দোলন মঞ্চের সহসম্পাদক নাছিমা আক্তার। রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৭৪ সাল থেকে এ দিবস সারা বিশ্বে পালিত হয়। দুনিয়াব্যাপী পরিবেশ দূষণে সচেতনতা ও প্রতিকারের নিমিত্তে এ পরিবেশ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয় কিন্তু আমাদের দেশের সরকার পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য মানে কিনা আমাদের সংশয় আছে। কারণ এদেশে নদী, পানি, বায়ু যেভাবে দূষণ বাড়ছে এবং উন্নয়নের নামে যেভাবে গাছ কাটা হচ্ছে তাতে মনে হয় না এ বিষয়ে সরকারের কোন উদ্বেগ আছে।

তিনি আরও বলেন, নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা দুটি প্রধান নদী চরম দূষণ হয়ে প্রায় নর্দমায় পরিণত হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে মুখে রুমাল চেপে নদী পারাপার হতে হয়। অথচ দূষণ বন্ধে সরকারের কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেই। দূষণের জন্য দায়ী বিভিন্ন রাঘব-বোয়াল মিল-কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে সরকারের কোন কার্যকর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় না। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দেশের ২৫ ভাগ এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১



হরিজনদের কলোনি উচ্ছেদ করা চলবে না, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে

ঢাকার বংশালে মিরনজিল্লা হরিজন কলোনী উচ্ছেদের প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ১৪ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও শেষে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি কমরেড শাহীন রহমান, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নজরুল ইসলাম, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির নেতা শহীদুল ইসলাম সবুজ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী। সমাবেশ পরিচালনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য খালেদুজ্জামান লিপন। সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন হরিজন নেতা পাতপুরী জেমস, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের হেমন্ত সরকার প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, হরিজনরা কারো কোন সম্পত্তি দখল করেনি। তাদেরকে আসামসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আসার পর বংশ পরম্পরায় গত ৪০০ বছর ধরে বংশালের মিরনজিল্লা হরিজন কলোনিতে বসবাস করে আসছে এবং শহর পরিষ্কার রেখে মানুষদের



সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এই কলোনীই তাদের শেষ আশ্রয়স্থল। তারা সবসময় অবহেলার শিকার হয় এবং অমানবিক পরিবেশে ছোট ১০ ফুট বাই ১০ ফুট ঘরে স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, পুত্র বধু নিয়ে একসাথে গাদাগাদি করে তাদের জীবনযাপন করতে হয়। এদের বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা না করে এই উচ্ছেদ অভিযান কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। একদিকে প্রধানমন্ত্রী আবাসন উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছেন, দেশে গৃহহীন কোন মানুষ থাকবে না, আরেকদিকে তার ভাগিনা মেয়র তাপস হরিজনদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ

করছে। এই দ্বিচারিতা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, এই হরিজনরা ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। ১১ জন হরিজন নেতা জীবন উৎসর্গ করেছেন। সেই হরিজনদের ভূমির অধিকারের দীর্ঘদিনের দাবি না মেনে সরকার তাদের উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে। ইতিমধ্যে পরিচ্ছন্নতাকর্মী নাম করে হরিজনদের চাকরি না দিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের চাকরি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করছে সিটি কর্পোরেশন ও

পৌরসভাসমূহ। শুধু তাই নয়, আগে যেমন আমৃত্যু কাজ করতে পারতো বর্তমানে চাকরির সীমা ৫৯ বছর করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন নির্মিত ভবনগুলো থেকে ৫৯ বছর বয়সের পর তাদেরকে ঘর ছেড়ে দিতে হয়। তাছাড়া নিজস্ব দলীয় লোকদের নিয়োগ দিতে যখন তখন সামান্য অজুহাতে সুইপারদের চাকরিচ্যুত করা হয়। এতে বহু হরিজন চাকরি ও থাকার ঘর ছাড়া হয়েছে। চাকরি থাকুক আর না থাকুক হরিজনদের এই কলোনিতে থাকা ছাড়া বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই। তাদের জন্য স্থায়ীভাবে ঘর বরাদ্দ করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের ৫৩ বছরে আজ তারা তাদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবে, আর সিটি কর্পোরেশনের যোগসাজসে মার্কেটের নামে ধনী-লুটেরাদের গোষ্ঠী তা ভোগদখল করবে তা মেনে যায় না।

নেতৃবৃন্দ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে মিরনজিল্লা হরিজন কলোনিতে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। একই সাথে ১১ জুন উচ্ছেদ অভিযানে ক্ষতিগ্রস্ত হরিজনদের যথায় যথায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ হরিজন কলোনির সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সংকটের চক্রে ঘূর্ণায়মান বাজেট ২০২৪-২৫ : কর, বৈদেশিক ঋণ, দ্রব্যমূল্যের বোঝা বাড়াবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শেষ পর্যন্ত ঋণের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। এই ঋণের বড় অংশই এসেছে ব্যাংক খাত থেকে। বিদেশি ঋণও নিতে হয়েছে বড় পরিমাণে। ফলে গত অর্থ বছরে যেমন সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করতে হয়েছে ঋণ ও সুদ পরিশোধে, সেই ধারা চলবে আগামী অর্থবছরেও।

ইতিমধ্যেই সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সুদ পরিশোধ একটা বড় মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মাথাব্যথা কমবে না বরং বাড়বে। এর ফলে অর্থনীতির প্রায় সব ক্ষেত্রেই সরকারকে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। অর্থনীতির সংকট দীর্ঘমেয়াদি হবে। অর্থনীতির যে সূচকগুলো নেতিবাচক সেগুলো ইতিবাচক করার তেমন কোন পদক্ষেপ দৃশ্যমান হয়নি এবারের বাজেটে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী তিন মাসেই ব্যাংকগুলোতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩৬ হাজার কোটি টাকার বেশি। গত মার্চের শেষে ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৮২ হাজার ২৯৫ কোটি টাকা, যা বিতরণ করা মোট ঋণের ১১ দশমিক ১১ শতাংশ। গত ডিসেম্বরে খেলাপি ঋণের হার ছিল ৯ শতাংশ। দেশে এর আগে খেলাপি ঋণ বেড়ে কখনো এতটা হয়নি। একদিকে ঋণ খেলাপি বাড়ছে অন্যদিকে সরকার বাজেটে দেশের ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছে। ফলে দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে।

শিক্ষা খাতে যে বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, তা গতানুগতিক। একই বৃত্তে ঘুরছে শিক্ষার বাজেট। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা-৪ পূরণ অর্থাৎ গুণগত শিক্ষার, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই বাজেট যথেষ্ট নয়। টাকার অঙ্কে বরাদ্দ কিছুটা বাড়লেও বাজেটে তা দাঁড়াচ্ছে ১১.৯ শতাংশ। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় বাজেটের ২৫ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দের দাবি থাকলেও সেটি পূরণ হয়নি। আবার শিক্ষার যে বরাদ্দ তার মধ্যে উন্নয়ন ব্যয়ের বেশির ভাগই ব্যয় হয় অবকাঠামোতে। আর পরিচালন ব্যয়ের বেশির ভাগ খরচ হয় বেতন-ভাতা বাবদ। ফলে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের জন্য এবারের শিক্ষা খাতের বাজেট প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটায়নি।

বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪১ হাজার ৪০৮ কোটি টাকা। এটি প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটের ৫ দশমিক ১৯ শতাংশ। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দুরবস্থা নিরসনে এই বরাদ্দ যথেষ্ট নয়। আবার বাজেট যখন সংশোধিত হয়, তখন দেখা যায় স্বাস্থ্যের বরাদ্দের এই হার আরও কমে যায়। গত অর্থবছর অর্থাৎ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ছিল জাতীয় বাজেটের ৪ দশমিক ৯৯ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে তা কমে হয় ৪ দশমিক ১৬ শতাংশ। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে ধারণা করলে তা ভুল হবে না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জানিয়েছে, দেশে শিশুমৃত্যু বাড়ছে। অনেক বছর ধরে মোট প্রজনন হার এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। পাশাপাশি চিকিৎসা করতে গিয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যয় অনেক বেশি প্রায় ৭০ শতাংশ। এই হার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বেশি। ফলে চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যে কম বরাদ্দ পরিস্থিতি আরও খারাপ করে তুলবে।

কৃষি খাতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১১.৫ শতাংশ বরাদ্দের সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও বাজেটে এ খাতে উন্নয়নে বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ৪.৯৯ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কৃষি মন্ত্রণালয়ে মোট ২৭ হাজার ২১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ছিল ৩৩ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা। সে হিসাবে আগামী বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমানো হয়েছে। কৃষিতে একটা নেতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য

করা যাচ্ছে, যা বিপজ্জনক। বিবিএসের হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে ২০২৩ সালে কৃষকের সংখ্যা কমেছে প্রায় ১৫ লাখ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রান্তিক চাষি যাঁরা লাভবান হচ্ছেন না বা পণ্যের মূল্য পাচ্ছেন না তাঁরা অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। কৃষি উৎপাদন করতে গিয়ে কৃষকদের সব দিক দিয়েই খরচ বাড়ছে। বিশেষ করে শ্রমিকের খরচ বাড়ছে। কিন্তু এই চিত্র প্রতিবছরই দেখা যাচ্ছে যে, কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। যে দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন তাতে উৎপাদন খরচ উঠছে না।

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১০ লাখ মানুষকে যুক্ত করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চলতি অর্থবছরে ১ লাখ ৩৬ হাজার ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর আগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমে ১ লাখ ২৬ হাজার ২২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। অর্থের হিসাবে এবার বরাদ্দ বাড়ছে ৯ হাজার ৭৫৪ কোটি টাকা।

বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নতুন করে ৯ লাখ ৮১ হাজার ৬১ জনকে যুক্ত রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। এতে ভাতাভোগী হবেন আরও ৩ লাখ ৩৪ হাজার প্রতিবন্ধী, ১ লাখ ৫০ হাজার ৪৮০ জন সন্তানসম্ভবা নারী, ২ লাখ বয়স্ক ব্যক্তি, ২ লাখ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা, ৫ হাজার ৭৪৯ তৃতীয় লিঙ্গ এবং ৯০ হাজার ৮৩২ জন অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সদস্য।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বেদে এবং হিজড়া সম্প্রদায়সহ প্রান্তিক জন গোষ্ঠীর সুরক্ষা ও জীবনযাত্রার মান বাড়াতে মোট ১২ হাজার ৬২৯ জনকে ভাতার আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বাজেটের এই বর্ণনা শুনলে বেশ ভালো লাগারই কথা। কিন্তু অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কত শতাংশ মানুষ এই ভাতার আওতায় আসছেন তা দেখলে ভালো লাগাটা বিষণ্ণতায় পরিণত হয়ে যায়। ভাতা হিসেবে মাসে ৬০০ টাকা আসলে কতখানি সহায়তা করে দ্রব্যমূল্যের বর্তমান সময়ে?

বাংলাদেশে প্রায় ৬৫ লাখ দলিত জনগোষ্ঠীর বসবাস। আর্থ-সামাজিক সকল বিবেচনায় তারা দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। এই অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বাজেটে ধারাবাহিকভাবে পৃথক ও সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন এবং দরিদ্র হিসেবে বাজেটে এই জনগোষ্ঠীর দাবি সর্বাত্মে বিবেচনার দাবিদার। বিশেষত, আবাসন, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য বিষয়ে দলিতদের তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা প্রয়োজন।

ভূমি সংস্কারে এবং প্রান্তিক কৃষকদের জন্য কোনো বাজেট বরাদ্দ কোন বছরই থাকে না। বাজেটে প্রান্তিক ও জুমচাষিদের জন্য রেশনিংয়ের ব্যবস্থা এবং আদিবাসী, দলিত, হরিজন এবং চা-শ্রমিকদের জন্য বাজেটে বরাদ্দ করার দাবি দীর্ঘদিনের, এবারের বাজেটেও তা বরবরের মতো উপেক্ষিত।

আদিবাসীদের উন্নয়নের ধারায় আনতে হলে, এসডিজি’র লক্ষ্যপূরণ করতে হলে জাতীয় বাজেটে পৃথকভাবে যথেষ্ট বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ে আদিবাসী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নেই বলেই বহুকাল ধরে নৃগোষ্ঠীর জীবনে জাতীয় বাজেট বরাদ্দ বা ব্যাপক উন্নয়নের অর্থপূর্ণ প্রতিফলনও নেই। তারা ভূমিহীন, দেশান্তরী মজুর, শিক্ষায় পিছনে, খাওয়ার পানি, সেচের জন্য পানি পাওয়ার ক্ষেত্রেও বঞ্চিত। গত কয়েক বছর ধরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া ও আলাদা করে বাজেট বরাদ্দ আমরা দেখছি। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে সমতল ও পাহাড়ের আদিবাসী জনগোষ্ঠী বরাবরের

মতো উপেক্ষিত।

এক হিসেবে দেখা যায় দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বাড়লেও নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে দারিদ্র্যের হার বেড়ে গিয়ে প্রায় ৬০ শতাংশের উপরে উঠে গেছে। রাস্তামাটি আর বান্দরবানে এই দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ৬৪ শতাংশ এবং ৬৩ শতাংশ। সমতল অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা দিনাজপুরে এই হার ৬৪.৩ শতাংশ। আদিবাসীদের মাথাপিছু আয় জাতীয় গড় আয় থেকেও অনেক কম। পাহাড়ের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে যা ২৬ শতাংশ কম, সমতলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ৪১ শতাংশ কম। সমতলের দুই-তৃতীয়াংশ আদিবাসী কার্যত ভূমিহীন। যদি বাজেটের মূল লক্ষ্য হয় বৈষম্য হ্রাস ও দারিদ্র্য বিমোচন। তাহলে বাজেটে ব্যয় বরাদ্দে অগ্রাধিকার ও আয় কাঠমোতে জোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা পরিলক্ষিত হয়নি বাজেটে।

বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে বাজেটে গ্রামীণ নারীদের জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো, কৃষক হিসেবে নারী কৃষকদের স্বীকৃতি দিয়ে তা কার্যকরে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান, নারী কৃষকদের কৃষি ও স্বাস্থ্য বিমার জন্য বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণে বরাদ্দ রাখা, বাজেট বৈষম্য হ্রাসে আদিবাসী মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ বৃদ্ধি, সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন ইত্যাদি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু বাজেটে নেই এসবের কোনো প্রতিফলন।

আমরা জানি বঙ্গোপসাগর বরাবর উপকূলীয় তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১০ কি.মি.। সংকট ও সম্ভাবনাময় এলাকা হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল। এখানে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বেশি। এছাড়া প্রাকৃতিক ও মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগসমূহ যেমন নদীভাঙন, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক, জলাবদ্ধতা-ভূমিকম্প, পানি ও মাটিতে লবণাক্ততা, নানা রকমের দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাবের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের জীবন ও জীবিকার ধারা যেমন বাধাগ্রস্ত হয়েছে তেমনি এ অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিও হয়েছে মহুুর। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় রেমাল উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষকে আরও প্রান্তিক পর্যায়ে ঠেলে দিয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা দরকার। শুধু ত্রাণ নয় প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ দরকার ছিল। কিন্তু উপেক্ষিত হয়েছে এই বিষয়গুলো।

বেকারদের কর্মসংস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু বাজেটে তার কোন নির্দেশনা নাই। জনমিতির সুবিধা তাই কথার কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে বরং সস্তা শ্রমের দেশে পরিণত করেছে বাংলাদেশকে।

একদিকে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্লোগান অন্যদিকে ক্রমাগত মুঠোফোনে কথা বলা ও ইন্টারনেট সেবার উপর ক্রমবর্ধমান ভ্যাট আরোপের ফলে, ১০০ টাকার টক টাইম পেতে এখন গ্রাহককে দিতে হবে ১৩৯ টাকা। মেট্রো রেলের সাফল্য নিয়ে বিপুল প্রচারের পর এখন এর ভাড়ার উপরও ভ্যাট আরোপ করা হচ্ছে। যা জনজীবনে ভোগান্তি বাড়াবে।

দুর্নীতি, মূল্যস্ফীতি, টাকা পাচার, ব্যাংক লুটের যে মিলিত চক্রে দেশের মানুষের দুর্দশা বাড়িয়েছে তা নিরসনে কোন উদ্যোগ না নিয়ে বরং জনগণের উপর করের বোঝা চাপানো হয়েছে। বাজেট নিয়ে সরকারি মহলের বাগাড়ম্বর দিয়ে অর্থনীতির সংকট দূর হবে না।

দেশের দুর্নীতি নিয়ে কথা বললেই শাসক দলের নেতারা বলেন, এরকম দুর্নীতি সব দেশেই আছে। কিন্তু দেশের নাগরিকরা তো বিদেশের

সাথে তুলনা করবে না। তারা ভুক্তভোগী হিসেবে দেখছেন যে, কোনো সরকারি সেবা নিতে গেলেই দুর্নীতির শিকার হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার সেবা গ্রহণকারীরাও কোনো অন্যা্য সুযোগ, যেমন কর ফাঁকি দেওয়ার জন্যই দুর্নীতি করেন। তারা ঘুষ দেন। ফলে কেউ ঘুষ দেয় বাধ্য হয়ে আর কেউ দুর্নীতিকে আড়াল করার জন্য ঘুষ দেন। আর ঘুষ নেওয়া অপরাধ হলেও ঘুষ দেওয়া অপরাধ বলে প্রচারিত হয় না।

বাংলাদেশের দুর্নীতির কারণ ও উৎস নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারা সবাই বলবেন এদেশে দুর্নীতি-অনিয়মের সবচেয়ে বড় উৎস হলো ক্ষমতার রাজনীতি। আর দুর্নীতি বিস্তৃতি ঘটছে অনুগত স্বার্থাশ্বেষী গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যা্য সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করার ফলে। এ কারণেই সম্পদের অসম বণ্টন বাড়ছে, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে এবং এভাবেই দেশ চলবে, এই ধারণা শক্তিশালী হচ্ছে দিন দিন।

বাঘ যখন হরিণের পালে আক্রমণ করে তখন দুর্বল হরিণটিকেই শিকারের জন্য বেছে নেয়। বাজেটের করনীতি সেরকমেরই। সাধারণ মানুষের ওপর জ্বালানি ও বিদ্যুৎ-এসব সেবার বাড়তি খরচ চাপানো যেমন সহজ, মোবাইল ফোনের ইন্টারনেট ব্যবহারে ভ্যাটের ওপর সম্পূরক শুল্ক আরও বাড়িয়ে দেওয়াও তেমনি সহজ উপায় মনে করা হয়েছে। কিন্তু ফোন তো এখন নিত্যব্যবহার্য সেবা। আয়করের উচ্চতম হার বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছে। যাঁরা সঠিক সম্পদের হিসাব দেন, তাঁদের ক্ষেত্রে সারচার্জসহ এ হার আরও বেশি। কিন্তু কালোটাকা বা অপ্রদর্শিত আয়কে ১৫ শতাংশ হারে কর দিয়ে বিনা প্রশ্নে বৈধ করার সুবিধা অন্যা্য্য ও অনৈতিক। এর ফলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটা নৈতিকতাহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথটাকেই স্থায়ী রূপ দেয়া হচ্ছে।

পুঁজিবাদকে ক্রমাগত শক্তিশালী করার স্বার্থে শোষণ ও লুণ্ঠন সহায়ক বাজেট তৈরি হয়ে আসছে গত ৫২ বছর ধরেই। বাজেটের নীতি কৌশল একই থাকায় এবারের বাজেট অতীতের বাজেটের মতই ফল নিয়ে আসবে। বাজেটের পর মানুষ দেখবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কর দরের বোঝা বৃদ্ধি আর ধনীদের সম্পদ বৃদ্ধি।

জাহেদুল হক মিলুর স্মরণসভা ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

গিয়ে শোষিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, কমরেড মিলু যে শোষণমুক্ত সাম্য সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজও অপূরিত। বর্তমানে দেশে চলছে চরম ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন। দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। রিজার্ভ ১৩ বিলিয়ন ডলারে এসে নেমেছে। ব্যাংকগুলো ফাঁকা হয়ে গেছে। ব্যাংকের টাকা নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না, ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপি হয়ে যাচ্ছে। এবারের বাজেটেও কালো টাকা সাদা করার বিধান রেখে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ কমেছে, বেড়েছে অনুৎপাদনশীল খাতে। গ্রাম শহরের গরিব মানুষের রেশন, নিত্য পণ্যের দাম কমানোসহ জনগণের দাবির কোন প্রতিফলন বাজেটে নেই। জনগণের উপর করের বোঝা বাড়ছে।

নেতৃবৃন্দ কমরেড মিলুর সংগ্রামী জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইকে জোরদার করার জন্য দলের নেতা-কর্মীসহ সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সভার শুরুতে বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটি ও বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ কমরেড মিলুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

সংস্কৃতি খাতে জাতীয় বাজেটের ১ শতাংশ বরাদ্দ দাবি : চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র



জাতীয় বাজেটের ১ শতাংশ সংস্কৃতি খাতে বরাদ্দের দাবিতে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৬ জুন '২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নিখিল দাসের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কবি কামরুজ্জামান ভূঁইয়া, বিপুল কুমার দাস, জসিম উদ্দিন, প্রদীপ সরকার। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদুজ্জামান লিপন ও ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুজা বাউড়ে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ৩০ জুন '২৪ জাতীয় সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকার বাজেট পাশ হবে। এই বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতসহ অনুৎপাদনশীল খাতে বরাদ্দ যেমন বেড়েছে, আবার শিক্ষা, স্বাস্থ্য-কৃষি, সংস্কৃতিসহ উৎপাদনশীল খাতগুলোতে বরাবরের মতো এবারও বাজেট কমেছে। সংস্কৃতি খাতে বরাদ্দ করেছে শুন্য দশমিক শুন্য নয় শতাংশের কিছু বেশি। এটি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এখাতে কমপক্ষে ১ শতাংশ বরাদ্দ করা দরকার। সরকার একদিকে জঙ্গি দমনের জন্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বাড়ানোর কথা বলছে এবং নিজেকে সংস্কৃতি বান্ধব বলছে আরেকদিকে প্রয়োজনমত বরাদ্দ সংস্কৃতি খাতে করছে না। এতে সরকারের দ্বিচারিতা প্রকাশ পায়।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, যুব সমাজকে কিশোর গ্যাং ও মাদক থেকে মুক্ত করতে হলে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে গণগ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স গড়ে তুলতে হবে। যেখানে থাকবে গ্রন্থাগার, প্রেক্ষাগৃহ, নাট্যশালা, সাহিত্য-সংগীত ও নৃত্যের জন্য আলাদা মঞ্চ। প্রতি জেলায় চারুকলা প্রদর্শনীর জন্য আর্ট গ্যালারি, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্রের জন্য মিনি অডিটোরিয়ামসহ লোক সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এর জন্য দরকার জাতীয় বাজেটের ন্যূনতম ১ শতাংশ বরাদ্দ।

নেতৃবৃন্দ বরাদ্দকৃত অর্থ সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনারও দাবি জানান।

রিস্রা-ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বরিশাল রিস্রা-ভ্যান চালক-শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি. খুলনা-২৩২৪)-এর সম্মেলন ১ জুন জেলা অশ্বিনী কুমার হলে দুলাল মল্লিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতিত্বে কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সহ-সম্পাদক ইমাম হোসেন খোকন, রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জনার্দন দত্ত নাটু, বাসদ বরিশাল জেলার সমন্বয়ক ডা. মনীষা চক্রবর্তী।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে আইনের আওতায় ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলের অনুমতি দিয়েছেন। বরিশালে রিকশা ইউনিয়নের নেতৃত্বে ও পরবর্তীতে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ২০১২ সাল থেকে সারাদেশে এই দাবিতে সংগ্রাম করে আসছে। ৬০ লাখ মানুষের আত্ম কর্মসংস্থানের এই পেশার

উপর শাসকশ্রেণি বারবার আঘাত করে ও কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকাকে সংকটগ্রস্ত করেছে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাঁদাবাজি, দখলদারত্ব অব্যাহত রাখতেই ব্যাটারি রিকশা উৎপাদনের সকল প্রক্রিয়া চালু রেখে শুধুমাত্র চালানোর উপর বিভিন্ন মাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রাখা হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষ শাসকদের সকল চক্রান্তকে পরাস্ত করে বিজয় ছিনিয়ে আনবে।

আলোচনাসভা শেষে ২০১৮ সালে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্সের আন্দোলনে গ্রেপ্তারকৃত ও কারানির্ধারিত ২৫ নেতাকে রিকশা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এরপর কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন বরিশাল রিস্রা-ভ্যান চালক-শ্রমিক ইউনিয়নের নবনির্বাচিত কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন।

সম্মেলনে দুলাল মল্লিক সভাপতি : মনির হোসেন সর্দার সহসভাপতি : ডা. মনীষা চক্রবর্তী সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি নির্বাচিত হয়। আলোচনাসভার শেষে নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়।



শ্রমজীবীদের রেশন, আবাসন-চিকিৎসাসহ সামাজিক সুরক্ষায় বাজেটে বরাদ্দ বাড়াও

বাজেটে শ্রমিক-কৃষকের ন্যায্য হিস্যা, শ্রমজীবীদের রেশন, আবাসন, চিকিৎসাসহ সামাজিক সুরক্ষা খাতে বাজেট বাড়ানো এবং বরিশালে ফরচুন, প্রিমিয়ার এবং এম জে সুজ কারখানার শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণের জন্য দায়ীদের শাস্তির দাবিতে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে ২৪ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা নগর কমিটির সভাপতি রতন মিয়ান সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক খালেদুজ্জামান লিপনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, কোষাধ্যক্ষ আবু নাজিম খান বিপ্লব, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, সদস্য রাহাত আহমেদ, এস.এম. কাদির, অ্যাড. মাসুদ আহমেদ, অ্যাড. ফারুক হোসেন, ফজলুল হক শাহিন, তানভীর নাজিম, জালাল আহমেদ প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার জাতীয় সংসদে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট উত্থাপন করতে যাচ্ছে। আর বাজেটের প্রধান অংশ যথার্থীতি বেতন-ভাতা পরিশোধে ব্যয় হবে। বছর বছর বাজেটের অবয়ব বাড়ছে, বাড়তি বাজেটের অর্থের জোগান দিতে বাড়ছে কর, বাড়ছে ব্যাংক ঋণ, ঘটছে মুদ্রাস্ফীতি, বাড়ছে আয় বৈষম্য। নিত্যপণ্যের উচ্চমূল্যের চাপে পিষ্ট হচ্ছে শ্রমজীবী



মানুষ কিন্তু রাষ্ট্রের এই উন্নয়ন তার আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে না, দিচ্ছে না কাজের নিশ্চয়তা। ফলে, মুখে দারিদ্র্য দূরীকরণ, মুক্তিযুদ্ধের সাম্যের চেতনার যত কথায় বলা হোক, বাজেটের অগ্রাধিকার তালিকা প্রমাণ করছে যে শ্রমজীবীদের যন্ত্রণাকাতর আত্মনাদ বাজেট প্রণয়নকারীদের কানে প্রবেশ করছে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, রাষ্ট্রের সম্পদ উৎপাদনের জোয়াল যারা বহন করছেন সেই শ্রমজীবী মানুষের পুষ্টির নিশ্চয়তা, সুস্থ থাকার নিশ্চয়তা,

মাথার উপর ছাদ থাকার নিশ্চয়তা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করলে তা প্রকারান্তে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে বহুগুণে ফিরিয়ে দেবে। যা কর ফাঁকি দেওয়া, ব্যাংক ঋণ আত্মসাৎকারী কালোচাকার মালিকদের পিছনে বিনিয়োগ করে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া, জাতীয় আয়ে দেশের শ্রমজীবী এবং প্রবাসীদের অবদান বাজেটে তাদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাওয়ার দাবি রাখে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বরিশালে ফরচুন সুজ কোম্পানির মালিক শ্রম আইন লঙ্ঘন করে শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রেখে কোটি কোটি টাকা ক্রিকেট দলের স্বত্ত্ব কিনতে ব্যয় করেছে। নির্ধারিত সময়ে মজুরি পরিশোধ না করে শ্রমিকদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। মাসের পর মাস শ্রম আইন লঙ্ঘন করে শ্রমিকদের শোষণ করেছে। সময় দিয়েও শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধ না করে শ্রমিকদের ক্ষুব্ধ করে আনসার দিয়ে হামলা করানোর উস্কানি দেওয়ায় ফরচুন সুজের মালিককে গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশের কেন্দ্র শ্রমিকরা ব্যাংক লুটেরা কারখানা মালিকরা নয়। অথচ সরকারের বিভিন্ন বাহিনী শ্রমিকদের রক্ষার পরিবর্তে সব সময় শিল্প মালিকদের ভাড়াটে বাহিনীর মতো নিন্দনীয় ভূমিকা পালন করছে। তারা শ্রমিকের বকেয়া বেতন ভাতা আদায় করে দেওয়ার জন্য কোনো ভূমিকা পালন না করলেও মালিকদের অন্যায় আচরণকে প্রশ্রয় আর শ্রমিকের উপর নির্যাতকের ভূমিকা পালন করে।

নেতৃবৃন্দ, শ্রমিকের উপর গুলিবর্ষণকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়া, শ্রমিকদের ক্ষতিপূর্ণ, চিকিৎসার খরচ প্রদান এবং শ্রম আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার দাবি জানান।

ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইক চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার ১২ বছরের আন্দোলন সফলতার পথে



ব্যাটারি রিকশা চলাচল বন্ধের ঘোষণার প্রতিবাদে ২০ মে ঢাকায় ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল



সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট ও রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ সিলেট মহানগর শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল



৪ জুন সংগ্রাম পরিষদের সংশোধনী প্রস্তাবনাসমূহ গ্রহণ করে খ্রি-হইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সূচ্য ব্যবস্থানা নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২১ চূড়ান্ত করাসহ ৭ দফা দাবিতে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় স্মারকলিপি প্রদান

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট দিনাজপুর জেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট দিনাজপুর জেলা শাখার সম্মেলন ২ জুলাই জেলার প্রেসক্লাবের হল রুমে সীমা সেকেন্দারের সভাপতিত্বে এবং শ্যামলী মূর্মুর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বাসদ জেলা আহ্বায়ক কিবরিয়া হোসেন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়ে, ছাত্র ফ্রন্টের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রিনা মূর্মু।

কাউন্সিলে সীমা সেকেন্দারকে সভাপতি, সূত্রকাশ রায় সহসভাপতি, মোকলেসুর রহমান সাধারণ সম্পাদক ও শোভন মার্ডিকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব সরকার নিজে না নিয়ে অভিভাবকদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে। ৬ জুন ২০২৪-২৫ অর্থবছর ৭ লাখ ৯৭ হাজার কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছে। এতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ মাত্র ৯৪ হাজার ৭১০ কোটি টাকা, যা বাজেটের মাত্র ১১.৮৮ শতাংশ। ইউনেস্কোর মতে, কোনো দেশের জিডিপি ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করা উচিত। সেখানে এ অর্থবছর শিক্ষাখাতে বরাদ্দ মাত্র ১.৬৯ শতাংশ! গত বছরের চেয়েও এবছর বরাদ্দ করেছে। শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের ২৫ শতাংশ বরাদ্দের দীর্ঘদিনের দাবিকে বরাবরের ন্যায় উপেক্ষা করে যে গতানুগতিক বাজেট প্রস্তাব করা হয়েছে তা শিক্ষার স্বার্থকে ধারণ করে না।



৩ জুন রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ খুলনা মহানগর কমিটির বিক্ষোভ মিছিল

জেলা-জুলাম, মামলা-হামলা, হয়রানি উপেক্ষা করে ব্যাটারিচালিত যানবাহন চালকদের আন্দোলন অবশেষে সাফল্যের মুখ দেখছে। লাইসেন্স প্রদান, আধুনিকায়ন ও চাদাবাজি বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিতে দীর্ঘ ১২ বছর সারা দেশে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ এ আন্দোলন চালিয়ে আসছে। গত ১৫ মে আকস্মিকভাবে ব্যাটারিচালিত যানবাহন নিষিদ্ধে সড়ক পরিবহন মন্ত্রীর ঘোষণার পর পরই হাজার হাজার শ্রমিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তা অবরোধে রূপ নেয়। ফলে, বিভিন্ন যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে শহর অচল হয়ে পড়ে। সরকার চালকের গ্রেপ্তার করে, পুলিশি নির্যাতন ও হয়রানি চালায়।

২০ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ। সমাবেশ থেকে মন্ত্রীর ঘোষণা প্রত্যাহারের ২৪ ঘণ্টা সময় বেধে দেয়া হয়। অন্যথায় সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় ঘেরাও-এর হুশিয়ারি দেওয়া হয়। লাগাতার আন্দোলনের মুখে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বরাত দিয়ে ব্যাটারি চালিত তিন চাকার রিকশা চালু রাখার সিদ্ধান্তের কথা জানান। মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশ দিয়েছেন জানিয়ে তিনি বলেন, নিম্নআয়ের মানুষের কথা বিবেচনায় এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তবে, শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকা শহরে ফিডার রোডে (মূল সড়ক নয় এমন রাস্তা) এই তিন

চাকার ব্যাটারিচালিত রিকশা চালু থাকবে। ৪ জুন সংগ্রাম পরিষদের ঢাকার অপর এক সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ বলেন, তারা নিয়ম মেনেই গাড়ি চালাতে চান। তারা চাদাবাজি হয়রানি বন্ধের ঘোষণা ও পদক্ষেপ দাবি করেন। বিআরটিএ-তে স্মারকলিপি প্রদানের মাধ্যমে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ নিয়ে আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

সংগ্রাম কমিটির ৮ দফা দাবি

১। ব্যাটারিচালিত যানবাহনের 'খ্রি-হইলার ও সমজাতীয় মোটরযান সূচ্য ব্যবস্থানা নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২১' চূড়ান্ত ও দ্রুত সরকারি গেজেট প্রকাশ করুন।

২। নীতিমালার আলোকে ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইকের নিবন্ধন, লাইসেন্স ও রুট পারমিট প্রদান কর।

৩। কারিগরি ত্রুটি সংশোধন করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের আধুনিকায়ন কর।

৪। চার্জিং স্টেশন স্থাপন করে বিদ্যুৎ চুরি ও অপচয় বন্ধ কর ও রাস্তায় কোষাগার সমৃদ্ধ কর।

৫। চালকসহ সংশ্লিষ্টদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সড়কের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা কর।

৬। অবৈধ চাদাবাজি, কার্ড/টোকেন বাণিজ্য, হয়রানি, অবৈধ রেকারিং ও ডাম্পিং বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭। প্রতিটি সড়ক মহাসড়কে ইজিবাইক, রিকশা, স্বল্প গতির ও লোকাল যানবাহনের জন্য আলাদা লেইন/সার্ভিস রোড নির্মাণ কর।

৮। ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক, রিকশাসহ সকল শ্রমজীবীদের জন্য রেশন, পেনশন, আবাসন ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।



বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সিরাজুল আলম খান

[স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক সিরাজুল আলম খানের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সিরাজুল আলম খান ফাউন্ডেশন ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে ৭ জুন জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে ‘স্বাধীনতার সংগ্রাম ও সিরাজুল আলম খান’ শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান। গুরুত্ব বিবেচনায় বক্তব্যটি ছাপা হলো।-সম্পাদক]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষ করে গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তৎপরবর্তীকালের উত্থান-পতন, নানা বাঁক পরিবর্তনে সিরাজুল আলম খানের দৃশ্য-অদৃশ্য, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না।

১৯৪১ সালের ৬ জানুয়ারি নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার আলিপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা বিভাগীয় স্কুল পরিদর্শক ছিলেন। স্কুল জীবন থেকেই পারিবারিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণ্ডির বাইরে সমাজ পরিবেশের দিকে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হতে থাকে। সে কারণে মেধাবী শিক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও আন্দোলনের রাজপথ তাঁকে আকর্ষণ করে বেশি এবং তিনি সে পথে পা বাড়ান। কলেজ জীবনে তার ছাপ রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সরাসরি সক্রিয় রাজনৈতিক-সাংগঠনিক কর্মোদ্যোগে নেমে পড়েন। আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আসার সময়কালের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা একটা মোড় নেয়। পাকিস্তান একটা অস্বাভাবিক রাষ্ট্র এবং পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলা উপনিবেশ সদৃশ এই চিন্তা বদ্ধমূল হতে থাকে। ১৯৬২ সালে ২১ বছর বয়সে ছাত্র লীগের অপর দুই নেতা আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফ আহমেদ তাঁর চিন্তার অনুসারী হয়ে ওঠেন। একটা অস্পষ্ট ভাসাভাসা স্বাধীনতার চিন্তা তাদের মনোজগতে স্থান করে নেয়। সিরাজুল আলম খান এটাকে আগামী দিনের পথ নির্দেশ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে বাকি দুই জনের অবস্থানকে কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস ধরে সতর্কতার সাথে ছাত্র লীগের অভ্যন্তরে গোপন সাংগঠনিক পরিধি বিস্তারে মনোযোগ দেন। এর আগে একসময় আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী পূর্ব-পাশ্চিম বৈষম্যের ক্ষোভে পাকিস্তানকে আছসালামু আলাইকুম (বিদায়) জানিয়েছিলেন। তবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে আপসহীন রাখতে না পেরে তিনি আওয়ামী লীগ ছেড়ে বামপন্থি শক্তিনির্ভর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) প্রতিষ্ঠা করেন। কেউ খাবে তো কেউ খাবে না-ভাসানীর এই স্লোগান সাম্য-সমতার পক্ষে একটা মনোভাব খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না কিন্তু সমাজতন্ত্রের পক্ষে এবং সমাজতন্ত্রীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর মতো এই বিশাল ব্যক্তিত্বের ছায়ায় বামপন্থি আন্দোলনের ধারা অগ্রসর অবস্থান থেকে প্রধান ধারায় বেরিয়ে আসতে পারতো। কিন্তু তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি ও মস্কো-পকিংসহ বহুধারার বিভক্তির কারণে তা হয়নি। বরং ভাসানীকে একা অবস্থানে রেখে বামপন্থি শক্তিসমূহ নানা বিক্ষিপ্ততায় ছড়িয়েছে। মওলানা ভাসানী একক প্রতিষ্ঠানের মতো দাঁড়িয়ে গণআন্দোলনের সামনে প্রফেট অব ভায়োলেন্স খেতাব লাভ করেন এবং সকল আপস ফর্মুলার মূলে কুঠারঘাত করতে থাকেন। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ৬ দফা কর্মসূচি নিয়ে হাজির হয়। বৈষম্য দূরীকরণ ও স্বায়ত্তশাসনকে সামনে রেখে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সামনে চলে

আসে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আপসকামী রাজনৈতিক ধারা তাঁর অনুপস্থিতিতে আপসপন্থি বিরুদ্ধবাদী ধারায় আওয়ামী লীগ এগোতে থাকে। এ অবস্থায় স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে স্বায়ত্তশাসন দাবিতে সীমাবদ্ধ না রেখে তা স্বাধীনতার আন্দোলনে নিয়ে যেতে হবে—এ বক্তব্য সিরাজুল আলম খান তাঁর নিউক্লিয়াসের মাধ্যমে ছাত্র-যুবকদের মধ্যে বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলতে থাকেন। সাড়াও মেলে প্রচুর। পাশাপাশি ভাসাভাসা হলেও স্বাধীনতার সাথে সমাজতন্ত্রকেও যুক্ত করেন। যার পরিণতিতে ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের মতো একটা বুর্জোয়া দলের ছাত্র সংগঠনে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রস্তাব নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হয়ে যায়। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের দায়ের করা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে আনে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পিছু হটে। কারাবন্দির মুক্তি লাভ করে। শেখ মুজিব ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদের মাধ্যমে ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু খেতাব লাভ করেন। ফলে মুজিবের মধ্যে হয় ক্ষমতা নয় যে কোন ঝুঁকি নেয়ার মানসিকতা প্রবল হয়ে ওঠে। একই সময়ে একদিকে ভাসানীর আপসহীন সংগ্রামী বক্তব্য ও সিরাজুল আলম খানের আওয়ামী লীগের ভিতর স্বাধীনতার লক্ষ্যে গতিমুখ ও শ্রোতধারা সৃষ্টির চেষ্টা পূর্ব বাংলার সীমানা জুড়ে এক সংগ্রামী আবহ সৃষ্টি করে। স্লোগানসমূহ পাণ্টে যেতে থাকে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ এর বদলে—জয় বাংলা, তোমার আমার ঠিকানা মক্কা আর মদিনার বদলে তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা, পিন্ডি না ঢাকা-ঢাকা ঢাকা, বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর, ২২ পরিবার খতম কর, জনগণতান্ত্রিক বাংলা কায়েম কর, ইত্যাদি। বিপরীত ধর্মী স্লোগানও ছিল কিন্তু সেগুলি ক্রমাগত শিয়মান হয়ে যায়।

এইভাবে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ ক্রণরূপে আত্মপ্রকাশ করে ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনকালে পূর্ণতা লাভ করে। ভোটে একে খণ্ডিত ও বিভক্ত করে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর পাকিস্তানি উপনিবেশিক শাসন বলবৎ রাখার পাকিস্তানি শাসকদের চক্রান্ত মওলানা ভাসানী নির্বাচনে অংশ না নিয়ে ব্যর্থ করে দেন। ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহের মধ্যে ত্রিদিব রায়কে হাত করতে পারলেও আদিবাসীদের মূল ধারার বাইরে নিয়ে যেতে পাকিস্তানি শাসকরা সমর্থ হয়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান ভিত্তিক একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। আওয়ামী লীগে আপসের পাল্লা ছিল ভারি। তাজউদ্দিন আহমদ, এম এ আজিজসহ একটা ক্ষুদ্র অংশ বড় ঝুঁকি নিতে অর্থাৎ ৬ দফা প্রশ্নে আপসহীন থাকতে কিংবা স্বাধীনতা পর্যন্ত ঝুঁকি নেয়ার পক্ষে ছিল। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ছাত্র লীগের বলিষ্ঠ অবস্থান আওয়ামী লীগের বড় অংশ আপসকামীদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। শেখ মুজিব উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা রক্ষা করার চেষ্টার পাশাপাশি একটা সম্মানজনক মিমাংসার কোন পথ আছে কিনা তা খুঁজে দেখছিলেন। তবে কোন অবস্থাতেই নেতৃত্ব হারাতে রাজি ছিলেন না। তাঁর এতটুকু বলিষ্ঠতা সিরাজুল আলম খানকে তাঁর আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলে এবং এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের বৈঠক যা হওয়ার কথা ছিল মার্চ মাসের শুরুতে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ঘোষণায় তা অনির্দিষ্ট করে দেন। তীব্র প্রতিক্রিয়া সারা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। একে কাজে লাগিয়ে সিরাজুল আলম খান কল্লিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করান এবং ডাকসুর সহসভাপতি আসম আব্দুর রবকে দিয়ে

২ জানুয়ারি ১৯৭১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহস্র ছাত্র জনতার সামনে উত্তোলন করান। তারপর ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে এক সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগ এর সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজকে দিয়ে স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করান এবং সেখানে অনেক বিষয়ের সাথে স্বাধীনতান্ত্রের শ্রমিক রাজ-কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও দেয়া হয়। এইভাবে আপসের পথ কটকাকীর্ণ করে তোলা হয়। এই পরিস্থিতিতে ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে শেখ মুজিব এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি পাকিস্তানি শাসকদের কাছে আপসের কয়েকটি শর্ত উত্থাপন করেন। একই সাথে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রামও বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করেন। জনগণ শেষের বার্তা অর্থাৎ শেখ মুজিব স্বাধীনতার কথা বলেছেন ধরে নিয়ে রাজপথ উত্তপ্ত করে বাড়ি ফেরেন। কিন্তু ৭ মার্চের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে দেন দরবারের আলোচনা শুরু হয়। পাকিস্তান থেকে আসতে থাকে সৈন্য ও অস্ত্র। ২৫ মার্চ শুরু হয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা আর তার বিপরীতে অগ্রসর হয় নিরস্ত্র জনগণের সশস্ত্র জনযুদ্ধ। যুদ্ধকালীন সময়ে আমজনতার পরিচয়ে আসা তরুণ-যুবকেরা এফএফ (ফ্রিডম ফাইটার) বাহিনী, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বিএলএফ (বেঙ্গল লিরারেশন ফ্রন্ট) ও পুলিশ-বিডিআর, আর্মির যোদ্ধারা মুক্তি ফৌজ পরিচয়ে সামরিক ট্রেনিং নেয় ও যুদ্ধ করে। নারীদের সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু হলেও তা বন্ধ করে দেয়া হয়। দেশের ভিতরে স্বউদ্যোগে বহু নারী যোদ্ধা পুরুষ যোদ্ধাদের সাথে অংশ নেন। বামপন্থিদের ট্রেনিং নেয়ার ক্ষেত্রেও নেতিবাচক অবস্থা ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন আসার পর মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের বিশেষ আয়োজনে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পকিং পন্থিদের প্রতি কড়া নজর রাখা হয়। বিশেষ করে নকশালপন্থিদের সাথে কোন সংযোগ ঘটে কিনা বা তাদের হাতে মুক্তিবাহিনীর অস্ত্র যায় কিনা সে বিষয়ে সতর্কতা ছিল। আমি আমার অতীত রাজনৈতিক পরিচয় গোপন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিচয়ে ট্রেনিং-এ যুক্ত হই। প্রথমে কোম্পানি কমান্ডার ও পরে সাবেক কুমিল্লা জেলার এফএফ বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব পাই। শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, আসম আব্দুর রবদের সাথে আমার যুদ্ধের আগে পরিচয় ছিল। বিএলএফ পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব ছিল চার জনের। শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ এই ৪ জন শীর্ষ নেতা ৪ খলিফা নামে পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের ৪ নেতা অন্য কথায় ৪ খলিফা নূরে আলম সিদ্দিকী, আসম আ. রব, শাহজাহান সিরাজ ও আবদুল কুদ্দুস মাখন। বিএলএফ গঠন পক্রিয়া সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী প্রাথমিকভাবে তেমন অবগত ছিলেন না। ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল উবান সিং-এর দায়িত্বে ছিলেন। সে সময় প্রথম সারির ৪ নেতা ও দ্বিতীয় সারির ৪ নেতার মধ্যে বিরোধের সূক্ষ্ম রেখা সুস্পষ্ট হতে শুরু করে। সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক প্রথম সারির এবং আসম আব্দুর রব ও শাহজাহান সিরাজ দ্বিতীয় সারির একই সমঝোতায় চলতে থাকেন। জেনারেল উবান ও শেখ মনির পরিকল্পনা ও দৃষ্টি ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তি ক্ষয় না করে যুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব যাতে আওয়ামী লীগের বাইরে অন্য রাজনৈতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণে না যায়। সিরাজুল আলম খান জোর দেন যুদ্ধে সরাসরি যুক্ত হয়ে অপরাপর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষীয় শক্তি, যোদ্ধা ও জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ ও একাত্ম

হওয়ার।

যুদ্ধকালীন সময়ে অনেকে যুদ্ধ পরিচালনা কেন্দ্রগুলো (সেক্টর) ভারতের লাগোয়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিয়ে আসা এবং ভারতীয় অবস্থান থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাকআপ সাপোর্ট এর প্রস্তাব রেখেছিলেন। এতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে এবং মুক্তিযুদ্ধ যে জনযুদ্ধ ছিল তার চেহারাও ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশিত হতো। কিন্তু তা হলো না। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ড তৈরি হলো। বাস্তবে যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কতৃৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। এ অবস্থা বামপন্থিদের কাছে তো বটেই নিউক্লিয়াসের কাছেও গ্রহণযোগ্য ছিল না। যার প্রমাণ আমরা প্রয়াত আব্দুর রাজ্জাকের দুঃখভরা ক্ষেদোক্তিতে পাই। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণকালেও ভারত যৌথ কমান্ডের মর্যাদা রক্ষা করেনি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধের মধ্য থেকে গড়ে ওঠা গণআকাক্ষর্য ও গণচেতনার পাশাপাশি স্বীকৃত অস্বীকারনামার বিপরীত মুখে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার সাথে সিরাজুল আলম খান একমত হতে পারেননি। মুজিববাদের কথা বলে হলেও সমাজতন্ত্রের ধারায় মুজিবকে সামনে রেখে এগুনো যায় কিনা সে কৌশল তিনি নিয়েছিলেন। এটা যে ভ্রান্ত এবং অপকৌশল স্বল্প সময়ের মধ্যেই তারা তা বুঝতে পারেন। এক পর্যায়ে শেখ মুজিবের এক পক্ষীয় অবস্থানের কারণে ছাত্র সংগঠনের বিভক্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে। আমরা লড়ছি শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য স্লোগানে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জড়ো হয় এবং সিরাজুল আলম খানের অঘোষিত নেতৃত্বে পরিচালিত হতে থাকে। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর নতুন দল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ গঠিত হয়। সিরাজুল আলম খান ঘোষিত কমিটিতে ছিলেন না। কিন্তু ভিতরে বাইরে সবাই জানতো এবং বুঝতো তিনিই ছিলেন মূল নেতা। তাঁর নিউক্লিয়াসের অপর দুই প্রধান সদস্য কাজী আরেফ আহমদ ও মার্শাল মনিও জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। অপর সদস্য আব্দুর রাজ্জাক আওয়ামী লীগেই থেকে গিয়েছিলেন। স্বাধীনতা পূর্বকালে ৬৮-৬৯ পর্যন্ত ছাত্র সংগঠনের বাইরে আওয়ামী লীগের শ্রমিক-কৃষকদের কোন সংগঠন ছিল না। সিরাজুল আলম খানই তাঁর একক সাংগঠনিক উদ্যোগী প্রচেষ্টায় শ্রমিক লীগ ও কৃষক লীগ গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু বিভক্তির পর দু-একজন নেতা বাদে উভয় সংগঠনের বেশির ভাগই আওয়ামী লীগের সাথে থেকে যায়। শেখ মুজিব স্বাধীন দেশে জীবিত ফিরতে না পারলে কী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা নিয়ে আওয়ামী লীগ ও ভারত নেতৃত্ব উভয়েই চিন্তিত ছিলেন। সে পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বাংলাদেশে প্রলম্বিত হতো হয়তো। মওলানা ভাসানী এবং বামপন্থি শক্তির ভীতি মুজিবের আগমনে প্রশমিত হয় কিন্তু আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্ধে এবং কোন্দলে অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ তৈরি হতে থাকে। লুটপাট, দুর্নীতি ব্যাপকতা লাভ করে। হিমালয় চূড়ার চেয়েও জনপ্রিয়তায় উর্ধ্বে উঠা শেখ মুজিবকেও বলতে শোনা যায়—স্বাধীন দেশে লোকে পায় সোনার খনি, আমি পাইলাম চোরের খনি। শেখ মুজিব শাসনকার্যে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে এবং দায়িত্ব নিতে বাধ্য হন। তাঁর জনপ্রিয়তার পারদ নামতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে নীতি আদর্শের স্লোগানে সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে প্রতিবাদ প্রতিরোধের শক্তি যদি না দাঁড়াতো তাহলে ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের যাঁতাকলে দেশবাসীকে স্বাধীনতার সূচনাপর্বই পড়তে হতো। মুক্তিযুদ্ধের এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

কৃষকের ঈদ

কাজী নজরুল ইসলাম

[২৫ মে ২০২৪ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫তম জন্মদিবসে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুলের সমাধিতে পুষ্পমাল্য প্রদান করা হয়। বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য লিখিল দাস, সদস্য জুলফিকার আলী, শম্পা বসুসহ নগর নেতৃবন্দ। আরও শ্রদ্ধা নিবেদন করে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। নজরুলের জন্মদিসব উপলক্ষে তাঁর রচিত ‘কৃষকের ঈদ’ কবিতাটি ছাপা হলো]

বেলাল! বেলাল! হেলাল উঠেছে পশ্চিম আসমানে,
লুকাইয়া আছ লজ্জায় কোন মরুর গোরস্থানে।
হের ঈদগাহে চলিছে কৃষক যেন প্রেত-কংকাল
কশাইখানায় যাইতে দেখেছ শীর্ণ গরুর পাল?
রোজা এফতার করেছে কৃষক অশ্রু-সলিলে হায়,
বেলাল! তোমার কণ্ঠে বুঝি গো আজান থামিয়া যায়।
থালি, ঘটি, বাটি বাঁধা দিয়ে হের চলিয়াছে
ঈদগাহে,
তীর খাওয়া বুক, ঋণে-বাঁধা-শির, লুটাতে খোদার রাহে।



জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিদ
মুমূর্ষ সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ?
একটি বিন্দু দুধ নাহি পেয়ে যে খোকা মরিল তার
উঠেছে ঈদের চাঁদ হয়ে কি সে শিশু-পাঁজরের হাড়?
আসমান-জোড়া কাল কাফনের আবরণ যেন টুটে।
এক ফালি চাঁদ ফুটে আছে, মৃত শিশুর অধর পুটে।
কৃষকের ঈদ! ঈদগাহে চলে জানাজা পড়িতে তার,
যত তকবির শোনে, বুকে তার তত উঠে হাহাকার।
মরিয়াছে খোকা, কন্যা মরিছে, মৃত্যু-বন্যা আসে
এজিদের সেনা ঘুরিছে মক্কা-মসজিদে আশেপাশে।
কোথায় ইমাম? কোন সে খোৎবা পড়িবে আজিকে ঈদে?
চারিদিকে তব মূর্দার লাশ, তারি মাঝে চোখে

বিধে
জরির পোশাকে শরীর ঢাকিয়া ধনীরা এসেছে
সেথা,
এই ঈদগাহে তুমি ইমাম, তুমি কি এদেরই নেতা?
নিঙ্গাড়ি’ কোরান হাদিস ও ফেকাহ, এই মৃতদের
মুখে
অমৃত কখনো দিয়াছ কি তুমি? হাত দিয়ে বল
বুকে।
নামাজ পড়েছ, পড়েছ কোরান, রোজাও রেখেছ
জানি,
হায় তোতা পাখি! শক্তি দিতে কি পেরেছ একটু
খানি?
ফল বহিয়াছ, পাওনিক রস, হায় রে ফলের বুড়ি,
লক্ষ বছর বর্ণায় ভবে রস পায় নাকো নুড়ি।
আল্লা-তত্ত্ব জেনেছ কি, যিনি সর্বশক্তিমান?
শক্তি পেলো না জীবনে যে জন, সে নহে
মুসলমান।
ঈমান! ঈমান! বল রাতদিন, ঈমান কি এত

শহিদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যুবার্ষিকীতে বাসদের শ্রদ্ধা নিবেদন



২৬ জুন শহিদ জননী জাহানারা ইমামের ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতনের নেতৃত্বে সকাল সাড়ে আটটায় মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

করা হয়। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নিখিল দাস, সদস্য জুলফিকার আলী, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য খালেদুজ্জামান লিপন প্রমুখ। আরও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

প্রত্যয় স্কিম বাতিল করতে শিক্ষক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন এবং চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সংস্কারের দাবি

বাম গণতান্ত্রিক জোট

বাম গণতান্ত্রিক জোট কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবি সভাপতি কমরেড শাহ আলম, সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশাররফা শিশু, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবীর জাহিদ, বাসদ (মার্কসবাদী) সমন্বয়ক মাসুদ রানা ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী ৭ জুলাই সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চলমান

আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, পেনশন একজন চাকরিজীবীর অর্জন এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তার কর্মজীবনের প্রতি সম্মান ও স্বীকৃতির বিষয়। অবসরকালীন জীবনের নিরাপত্তা হিসেবে পেনশনকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়সহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যয় নামে যে পেনশন স্কিম চালু করেছে তা একদিকে বৈষম্যমূলক অন্যদিকে শিক্ষকদের জন্য অসম্মানজনক। শিক্ষকদের মতামত না নিয়ে আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই স্কিম চাপিয়ে দেয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ তৈরি হয়েছে তা নিরসনের জন্য অবিলম্বে প্রত্যয় স্কিম

বাতিল এবং শিক্ষকদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য নেতৃবৃন্দ জোর দাবি জানান।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ চাকরির কোটা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধারা দেশের জন্য গৌরবের এবং শ্রদ্ধার বিষয়। এর সাথে চাকরির কোটা সংরক্ষণকে মুখোমুখি দাঁড়া করানো অপমানজনক। দেশের অনগ্রসর, পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কোটা সংরক্ষণ একটি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব আর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের ক্ষেত্রে কোটা মানবিক দায়িত্বের অংশ। কিন্তু বেকারত্ব, সরকারি শূন্য পদসমূহে নিয়োগ না দেয়া এবং নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্র যুব

সোজা?

ঈমানদার হইয়া কি কেহ বহে শয়তানি বোঝা?
শোনো মিথ্যুক! এই দুনিয়ায় পূর্ণ যার ঈমান,
শক্তিশ্বর সে টলাইতে পারে ইঙ্গিতে আসমান।

আল্লাহর নাম লইয়াছ শুধু, বোঝানিক আল্লাহে।
নিজে যে অন্ধ সে কি অন্যরে আলোকে লইতে পারে?

নিজে যে স্বাধীন হইল না সে স্বাধীনতা দেবে কাকে?

মধু দেবে সে কি মানুষে, যাহার মধু নাই
মৌচাকে?

কোথা সে শক্তি-সিদ্ধ ইমাম, প্রতি পদাঘাতে যার
আবে-জমজম শক্তি-উৎস বাহিরায় অনিবার?
আপনি শক্তি লভেনি যে জন, হায় সে শক্তি-হীন
হয়েছে ইমাম, তাহারি খোৎবা শুনিতেছি
নিশিদিন।

দীন কাঙ্গালের ঘরে ঘরে আজ দেবে যে নব
তাগিদ

কোথা সে মহা-সাধক আনিবে যে পুন ঈদ?
ছিনিয়া আনিবে আসমান থেকে ঈদের চাঁদের
হাসি,
ফুরাবে না কভু যে হাসি জীবনে, কখনো হবে না
বাসি।

সমাধির মাঝে গণিতেছি দিন, আসিবেন তিনি
কবে?

রোজা এফতার করিব সকলে, সেই দিন ঈদ
হবে।

পালন করবে বলে প্রত্যাশা করেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ সংবিধানের আলোকে সর্বজনীন, বিজ্ঞান ভিত্তিক, একই পদ্ধতির সেক্যুলার, বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত দাবিসমূহ বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান। দাবিসমূহ :

১. শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে সকল নাগরিকের জন্য বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ; শিক্ষার জাতীয়করণ;
২. বাজেটে শিক্ষা খাতে জিডিপির শতকরা ৬ ভাগ বরাদ্দ প্রদান;
৩. শিক্ষকদের সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদা ও বেতন ভাতা প্রদানসহ ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্ট এ স্থান নির্ধারণ এবং
৪. সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত দাবিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনায় বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করতে শিক্ষক সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

সমাজের মধ্যে যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে সেক্ষেত্রে কোটার নামে চাকরিতে পদ সংরক্ষণ তাদের ক্ষোভকে বাড়িয়ে তুলেছে। নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে দেশ পরিচালনা করে মুক্তিযোদ্ধাদের তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত ৩০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ করা কোনভাবেই মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান বৃদ্ধি করে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আদালতের উপর দায় চাপানো কিংবা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে প্রতিপক্ষ বানানো নয়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত রাজনৈতিকভাবেই গ্রহণ করতে হবে। নেতৃবৃন্দ কোটা পদ্ধতি সংস্কারে যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নেয়ারও আহ্বান জানান।

প্রবাসী শ্রমিকদের দুর্ভোগ এবং প্রতারণা কি বন্ধ হবে না?

ঢাকা বিমান বন্দরে এত মানুষের ভিড়, আহাজারি আর হতাশা আগে কখনো দেখেনি দেশের মানুষ। বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে, পাড়া পড়শিদের দোয়া নিয়ে ঢাকায় এসেছিলেন মালয়েশিয়া যাবেন বলে। বাবার পেনশনের টাকা, আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে কিংবা জমি বন্ধক রেখে, মায়ের গহনা কিংবা গরু বিক্রি করে তাদের অনেকেই মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য রিক্রুটিং এজেন্টের কাছে টাকা জমা দিয়েছিলেন। কেউ বা আবার টাকা সংগ্রহ করেছিলেন ব্যাংক থেকে কিংবা চড়া সুদে ঋণ নিয়ে। দেশে কিছু করতে পারছিলেন না, মালয়েশিয়ায় গিয়ে ভালো বেতনে চাকরি করে সংসারে সচ্ছলতা ফেরাবেন, ভবিষ্যৎ গড়বেন, এই ছিল স্বপ্ন। কিন্তু যেতে না পেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে তাঁদের। একরাশ হতাশা নিয়ে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ১ জুন ফিরে গেছেন কয়েক হাজার মানুষ।

মালয়েশিয়া সরকারের ঘোষণা ছিল, অনুমোদন পাওয়া বাংলাদেশি কর্মীদের সে দেশে প্রবেশের শেষ দিন ছিল ৩১ মে। শেষ দিনে যাবার সর্বশেষ চেষ্টা করতে তাই ৩০ মে ঢাকা বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন হাজারো মালয়েশিয়া যেতে প্রত্যাশী যুবক। কিন্তু তাঁরা সবাই যেতে পারেননি।

ভিসা ও অনুমোদন জটিলতায় ৩১ হাজার ৩০৪ জন কর্মী মালয়েশিয়া যেতে পারেনি বলে নিশ্চিত করেছে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) দায়িত্বশীল সূত্র। নিয়ম অনুযায়ী মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর আগে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন নিতে হয়। প্রশ্ন হলো, মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিতে পারে কিন্তু অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কি? কারণ, এজেন্সিগুলোর মালিক এবং সিডিকেটের কেন্দ্র বলে ক্ষমতাসীন দলের এমপি, সাবেক সামরিক বেসামরিক বড় বড় কর্মকর্তার নাম এসেছে। নিয়ম অনুযায়ী ৭০ হাজার টাকা প্রয়োজন হলেও, মালয়েশিয়া যেতে ইচ্ছুক একজন কর্মী গড়ে খরচ করেছেন ৫ লাখ ৪৪ হাজার টাকা। শেষ দিকে বিমানের টিকিটের দাম কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ার ফলে খরচের পরিমাণ আরও বেড়েছে। টাকা বেশি লাগে লাগুক তবু যেতে হবে এই মানসিকতার কারণে টাকা খরচ করতে দ্বিধা করেনি তাঁরা। যাঁরা ছাড়পত্র নিতে পারেননি, শুধু বিমান ভাড়া ছাড়া বাকি টাকা এজেন্সিকে দিয়েছেন। অর্থাৎ ৩১ হাজার ৩০৪ জন যেতে না পারা কর্মী কয়েক লাখ টাকা করে দিয়েছেন। যাওয়া তো অনিশ্চিত এখন টাকা ফেরত পাবেন কিনা, পেলেন কত ফেরত পাবেন, কবে পাবেন সেই দৃশ্টিভায়ে আছেন তাঁরা। মালয়েশিয়া যেতে টাকা জমা দিয়ে প্রতারণিত হওয়ার ঘটনা নতুন নয়। শ্রমবাজার চালু থাকার সময় অনেকেই বিদেশে যেতে প্রক্রিয়া শুরু করেন। এর মধ্যে কেউ কেউ হয়তো পাসপোর্ট করে এজেন্সির কাছে জমা দিয়েছেন। কেউ কেউ পাসপোর্ট, মেডিকেল করেছেন। এরা সবাই এজেন্সি বা দালালের মাধ্যমে কিছু কিছু করে টাকা দিয়ে রেখেছেন। এসব টাকা লেনদেনের কোনো মানি রসিদও থাকে না। বিদেশ গমনেচ্ছু এমন কর্মীর সঠিক সংখ্যা কত, তার কোনো সঠিক হিসাব প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সরকারের কোনো সংস্থার কাছে নেই। বায়রার যুগ্ম মহাসচিব বলেছেন, সব মিলে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীর সংখ্যা ৪০ হাজারের মতো হতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যের পর মালয়েশিয়া বাংলাদেশের বড় শ্রমবাজার। গত দেড় বছর সৌদি আরবের পর সবচেয়ে বেশি কর্মী গেছে মালয়েশিয়ায়, সাড়ে চার লাখের বেশি। শ্রমবাজারটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রবাসে যাওয়া এবং প্রবাসী আয়ের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কিন্তু কেন এই সংকট

দেখা দিল? এবারই প্রথম নয়, গত ১৫ বছরে তিন দফায় মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের শ্রমবাজার বন্ধ হয়েছে। প্রতিবারই শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে চক্র বা সিডিকেট গঠনের বিষয়টি সামনে এসেছে। এই চক্রের বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও ঘুষের প্রচুর অভিযোগ উঠেছে বারবার। ২০০৯ সালে প্রথম দফায় বন্ধ হয় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। এরপর ২০১৬ সালের শেষে খোলা হয় বাজারটি। তখন বাংলাদেশের ১০টি রিক্রুটিং এজেন্সি মিলে এক সিডিকেট সক্রিয় ছিল। দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে আবার বন্ধ হয়ে যায় মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার। ২০২২ সালে আবার মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার খোলে। তখন আবারও গড়ে উঠে সিডিকেট। গত মার্চে মালয়েশিয়া জানায়, দেশটি আপাতত আর শ্রমিক নেবে না। যাঁরা অনুমোদন পেয়েছেন, ভিসা পেয়েছেন, তাঁদের ৩১ মের মধ্যে মালয়েশিয়ায় ঢুকতে হবে। ফলে এটা তো জানা ছিলই, তাহলে এই হাজার হাজার কর্মীর না যেতে পারার দায় কে নেবে?

এ কথা তো জানা আছে যে, মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষ ২০২২ সালে শ্রমবাজার খোলার আগে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছিল। তখন প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় এজেন্সি নির্ধারণের দায়িত্ব দেয় মালয়েশিয়াকে। বাংলাদেশের এজেন্সি চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড ছিল না। ফলে পুরো সুযোগটি নিয়েছে মালয়েশিয়ার কর্মী নিয়োগের ফরেন ওয়ার্কার্স সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (এফডব্লিউসিএমএস) সফটওয়্যার মাইগ্রামের মালিক প্রতিষ্ঠান বেস্টিনেট। এটির মালিক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমিনুল ইসলাম বিন আবদুল নূর। তিনি মালয়েশিয়ার নাগরিক, আমিন নূর নামে পরিচিত। মালয়েশিয়া থেকে আমিন নূর কর্মী পাঠানোর পুরো বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করেন। বাংলাদেশে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন রিক্রুটিং এজেন্সি মালিকদের সংগঠন বায়রার সাবেক মহাসচিব রুহুল আমিন ওরফে স্বপন। তাঁরা দুজন মিলে বাংলাদেশি এজেন্সিদের নিয়ে গড়ে তোলেন সিডিকেট। প্রথমে মালয়েশিয়া কর্মী পাঠানোর চক্রে ছিল ২৫টি এজেন্সি। এরপর ধাপে ধাপে মোট ১০০ বেসরকারি এজেন্সি অনুমোদন পায়, আর এর সঙ্গে যুক্ত হয় সরকারি এজেন্সি বোয়েসেল। ফলে কর্মী দুর্ভোগের জন্য কাদের দায় তা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা না।

বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকদের দুর্দশার চিত্র বারবার উঠে আসছে। পৃথিবীর প্রথম দশটি কর্মী পাঠানোর দেশের তালিকায় বাংলাদেশ নবম। সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম ও কম বেতনের কাজগুলোই করে বাংলাদেশী শ্রমিকেরা আর বাংলাদেশের শ্রমিকদের বিদেশে যাওয়ার খরচ পৃথিবীর সব দেশের চাইতে বেশি। এক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ যে কি তা চোখে পড়ে না। কিন্তু দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান জোগানদাতা এই প্রবাসী শ্রমিকেরা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে গত ২৯ মে ১৮ দশমিক ৭২ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে। যদিও বাস্তব ব্যবহারযোগ্য রিজার্ভ ১৩ বিলিয়ন ডলারের মতো। এই তীব্র ডলার সংকট, টাকার দাম কমে যাওয়া, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, রিজার্ভ সংকটের দৃশ্টিভা, আর ঋণ নিতে গিয়ে আই এম এফের শর্ত এসব শঙ্কা জাগানো তথ্যের মধ্যে নতুন আশার খবর হলো, রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বেড়েছে। মে মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে মোট ২২৫ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে, যা প্রায় চার বছরের (৪৬ মাস) মধ্যে সর্বোচ্চ, আর এযাবৎকালে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এর আগে এক মাসে সর্বোচ্চ ২৬০ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স এসেছিল ২০২০ সালের জুলাই মাসে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য

অনুযায়ী, দেশে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে ২ হাজার ১৩৭ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় এসেছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের ১ হাজার ৯৪১ কোটি ডলারের চেয়ে ১৯৬ কোটি ডলার অর্থাৎ চেয়ে ১০ শতাংশ বেশি। সেবার পুরো অর্থবছরে এসেছিল ২ হাজার ১৬১ কোটি ডলার। এক মাস বাকি থাকতেই আগের অর্থবছরের প্রায় সমান ডলার প্রবাসীরা পাঠিয়েছে। গত এপ্রিলে প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলে ২০৪ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন, যা আগের বছরের একই মাসে ছিল ১৬৯ কোটি ডলার। পরিবারের কষ্টে উপার্জিত টাকা ঈদের আগে পাঠিয়ে থাকে প্রবাসীরা। সে কারণে প্রতিবছর ঈদের আগে প্রবাসী আয় বেড়ে যায়, এবারও তাই বেড়েছে। তবে এর চেয়েও বেশি রেমিটেন্স আনা সম্ভব যদি হুন্ডি বন্ধ করে ব্যাংকিং চ্যানেলে সমস্ত রেমিট্যান্স আনা যায়। কিন্তু এর মধ্যেই আর একটি সংকট দেখা দিয়েছে। কাগজপত্র বিহীন শ্রমিকদের বের করে দিচ্ছে মালয়েশিয়া সরকার। প্রত্যাবাসন কর্মসূচি অনুযায়ী এই বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বেচ্ছায় ৫০০ রিপ্তি জরিমানা দিয়ে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে দেশে ফিরতে প্রতিদিন ইমিগ্রেশনে ভিড় করছেন অভিবাসীরা। ঘোষণা অনুযায়ী দেশে ফিরতে হলে সরাসরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে ইমিগ্রেশন বিভাগের। সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে ওয়ানওয়ে এয়ার টিকিট ও পাসপোর্ট। যাদের পাসপোর্ট নেই তাদেরকে নিজ নিজ হাইকমিশন থেকে ট্রাভেল পারমিট সংগ্রহ করতে হবে। এর পরে ইমিগ্রেশন বিভাগে ৫০০ রিপ্তি জরিমানা দিয়ে স্পেশাল পাস দিলে পরবর্তী ১৪ দিনের মধ্যে দেশে ফিরতে পারবে অবৈধরা। দেশে ফেরা প্রবাসীদের এই তালিকায় বাংলাদেশিদের সংখ্যা বেশ লম্বা হবে বলে মনে করছেন অনেকেই। ফলে মালয়েশিয়ায় বর্তমানে থাকা প্রায় ১৫ লাখ বাংলাদেশিদের মধ্যে যারা অবৈধভাবে বসবাস করছেন তাদের মধ্যে বিরাজ করছে আতংক। দেশে ফিরে আসতে হবে প্রায় ১ লাখ বাংলাদেশিকে যার প্রভাব পড়বে রেমিটেন্সে এবং ফিরে আসা শ্রমিকদের জীবনে।

মালয়েশিয়ায় চারদিকে চলছে সাঁড়াশি অভিযান, ধরা পড়লে জেলের ঘানি টানতে হবে এই চিন্তা ততস্থ করে তুলছে অবৈধদের। দেয়ালবিহীন এ প্রবাস নামক কারাগারে বছরের পর বছর থাকতে না চাইলে, দেশে ফেরা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো উপায় নেই তাদের সামনে।

যারা দেশে ফিরছেন তাদের বেশিরভাগই কর্মহীন কিংবা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রবিহীন। অনেকেই সম্প্রতি কলিং ভিসায় গিয়ে প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ না পেয়ে প্রতারণার শিকার হয়ে ফিরে আসছেন দেশে। এভাবে দেশে ফেরাদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। এছাড়া ফ্রি ভিসার নামে কলিং ভিসায় মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়ে এসেছেন অনেক নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠান। এটা জানে সবাই কিন্তু প্রবাসীদের জীবনকে দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ফেলে যারা তারা থাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

পৃথিবীতে রেমিটেন্স আহরণকারী দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ সপ্তম। বিশেষ করে যে সমস্ত দেশ ২০ বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিটেন্স আয় করে তাদের মধ্যে ভারত ১১৯ বিলিয়ন, মেক্সিকো ৬৬ বিলিয়ন, চীন ৪৯ বিলিয়ন, ফিলিপাইন ৩৯ বিলিয়ন, ফ্রান্স ৩৪ বিলিয়ন, পাকিস্তান ২৬ বিলিয়ন, বাংলাদেশ ২২ বিলিয়ন এবং জার্মানি ২০ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স আয় করেছে ২০২৩ সালে।

বাংলাদেশের প্রবাসী শ্রমিকদের প্রধান গন্তব্য মধ্যপ্রাচ্য, তার পরেই আসে মালয়েশিয়ার নাম। শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি খরচ করে বিদেশে যায় বলে ২ অথবা ৩ বছরে তার টাকা তুলে আনতে পারে না। তাই অবৈধভাবে থাকার প্রবণতা বাড়ে।

ফলে প্রবাসে নানা ধরনের হয়রানি-অপমান, কষ্ট স্বীকার করে তারা দেশে টাকা পাঠান। কিন্তু দেশে ফিরেও সম্মান নেই। বিমান বন্দর থেকে বাড়ি পর্যন্ত নানা ধরনের হয়রানি সহ্য করতে হয় তাদেরকে। পরিবারের দায়, নিজের কর্মসংস্থান আর দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার পুরনের দায়িত্ব যারা পালন করেন, বিমান বন্দরে তাদের দায়িত্ব যারা পালন করেন, বিমান বন্দরে তাদের অনুভূত হবে না? যারা শ্রমিকদের এই দুর্দশার জন্য দায়ী তাঁরা কি শান্তির আওতায় আসবে না? নাকি দায়হীন দুর্দশা চলতেই থাকবে আর সরকার শুধু ডলার গুনবেন? প্রবাসে কর্মী হিসেবে যায় আমাদের যুবকেরা। যুবসমাজের দেশ ত্যাগ করার চিত্র সরকারের উন্নয়নের ফানুস ফুটো হয়ে যাচ্ছে। ফলে যুবশক্তি হারিয়ে দেশ কি পায় তা চিন্তা করার সময় এসেছে। সিডিকেটের কবলে পড়ে বিদেশে যেতে অতিরিক্ত ব্যয় ও হয়রানি বন্ধ যেমন সংগঠিত হওয়া দরকার তেমনি দেশে ফিরে আসার পর যেন সম্মানজনক ও নিরাপদ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় সে ব্যাপারেও পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

দুর্নীতিবাজ- অর্থপাচারকারীদের বিচার দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

পেয়েছে। এমনকি ২০২১ সালে শুদ্ধাচার পুরস্কারও পেয়েছে। আজিজ-বেনজীর-আনারের ঘটনার মধ্য দিয়ে দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতি ও রাজনীতির ভয়াবহ চেহারা ফুটে উঠেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রতি বছর দেশ থেকে ৭৬ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ব্যাংক লুটপাটকারীদের বিচারের আওতায় না এনে দেউলিয়া ব্যাংকগুলোকে অন্য ব্যাংকের সাথে একীভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে লুটপাটকারীরা আরও উৎসাহিত হবে। ১ লক্ষ ৩৬ হাজার কোটি টাকা খেলাপিঋণের কথা সরকার বললেও বাস্তবে তা প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকা হবে। পাচারকৃত টাকা ও খেলাপিঋণ উদ্ধারের কোন পদক্ষেপ নেই। প্রতি বছর বাজেটে ১০ শতাংশ পরিশোধের মাধ্যমে কালোটাকা সাদা করে বৈধতা দেয়া হচ্ছে। দেশে চরম অর্থনৈতিক সংকট চলছে। রিজার্ভ ১৩ বিলিয়ন ডলারে নেমেছে। একদিকে সরকার কৃচ্ছতা সাধনের কথা বলছে আরেকদিকে ডিসি ও ইউএনওদের জন্য ৩৮২ কোটি টাকায় কেনা হচ্ছে ২৬১টি ব্যয়বহুল গাড়ি। নেতৃবৃন্দ লুটপাচারী, দুর্নীতিবাজ, কালোটাকার মালিকদের দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ, আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং তাদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ ১ জুলাই থেকে ওয়াসার পানির দাম বোর্ড সভায় অনুমোদন না করে অবৈধভাবে ১০ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানান। তারা বলেন, এভাবে পানির দাম বাড়ানো অন্যা্য অযৌক্তিক ও অবৈধ। প্রতি বছর সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ পানির দাম বাড়ানোর বিধান ওয়াসা আইনে রয়েছে। কিন্তু মূল্যস্ফীতির ফলে জনজীবন এমনিতেই পূর্যুদস্ত ফলে নতুন করে পানির দাম বাড়িয়ে দুর্দশা বৃদ্ধি না করার দাবি জানান নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দুর্নীতি-লুটপাট, অর্থপাচার, ঋণখেলাপি, লুটপাটকারীদের পাহাদার ও পৃষ্ঠপোষক বর্তমান সরকার। ফলে শেখ হাসিনার অবৈধ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্বীর আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জে সমাজ অনুশীলন কেন্দ্রের সেমিনার অনুষ্ঠিত

এ বছর কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এ উপলক্ষে ৭ জুন নারায়ণগঞ্জ আলী আহম্মদ চুনকা নগর পাঠাগার ও মিলনায়তনে (পঞ্চম তলা) সমাজ অনুশীলন কেন্দ্রের উদ্যোগে ‘একুশ শতকে লেনিনের প্রসঙ্গিকতা’-বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন সমাজ অনুশীলন কেন্দ্রের সমন্বয়ক কমরেড বিমল কান্তি দাস। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাসদ নেতা ওমর ফারুক।

সেমিনারে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড নিখিল দাস, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি মুঙ্গীগঞ্জ জেলা কমিটির সাবেক সভাপতি কমরেড শ. ম. কামাল হোসেন, সমাজ অনুশীলন কেন্দ্রের সংগঠক কবি রঘু অভিজিৎ রায়, সিপিবি নেতা রনজিত কুমার দাস ও বিপ্লবী মজদুর পার্টির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ডা. সামছুল আলম প্রমুখ।

নেতৃত্বদ বলেন, যতদিন পৃথিবীতে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকবে ততদিন শোষণমুক্তির সংগ্রামে লেনিনের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা



নেবার প্রয়োজন হবে। এই একুশ শতকে এসে অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজে পরিমাণগত কিছু পরিবর্তন হলেও গত শতকের ধারাবাহিকতায় চলছে বর্তমান কালের বিশ্বব্যবস্থা। বরং এ শতকে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ শোষণ-শাসনের ক্ষেত্রে গত শতকের চেয়ে বেশি মাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ধারণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিগুলোর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ও যুদ্ধ আগের মতোই আছে কিন্তু সমাজতন্ত্র ও মেহনতি মানুষের আন্দোলন দমন এবং নিয়ন্ত্রণে তারা আগের যে কোন সময়ের তুলনায় (দেশে

দেশে শোষণের ক্ষেত্রে) বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের বিপর্যয়ের পর পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের লুটপাট ও শোষণ-নির্যাতনের মাত্রা বেশি বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে দেশে গণহত্যা চলছে। তাদের অতিরিক্ত মুনাফার লোভ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই কারণে তাদের অপরিবর্তিত শিল্পায়ন ও অপরিবর্তিত নগরায়নের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ ধ্বংস করে চলছে। মানুষের বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ আর থাকছে না। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকলে পৃথিবীর

প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

নেতৃত্বদ আরও বলেন, একুশ শতকে এসে অর্থনৈতিক বৈষম্য পাহাড় সমান বৃদ্ধি পাচ্ছে, গণতন্ত্র ও ডেটাধিকার সংকোচন করে বিশ্বব্যাপী এক স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা মুছে ফেলার আয়োজন চলছে। সংস্কৃতির ওপর নানাভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। খুন-ধর্ষণ, গণহত্যা ও সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি সমাজে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। গণতন্ত্রের পরিবর্তে চালু করা হচ্ছে বুর্জোয়া-স্বৈরতন্ত্র। সমাজতন্ত্র ও অস্টোবর বিপ্লবের পথ ছাড়া এ অবস্থা থেকে মানব জাতির মুক্তির অন্য কোন পথ খোলা নেই। এই পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও এই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে এর কোন সমাধান সম্ভব নয়। তাই মার্কসবাদ ও কমরেড লেনিনের কাছ থেকেই আজ আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

এছাড়াও সেমিনারে গণসংগীত পরিবেশন করেন সিপিবি নারায়ণগঞ্জ শহর কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সুজয় রায় চৌধুরী বিকু এবং লেনিনের উপর কবিতা আবৃত্তি করেন তিথি সুবর্ণা।

সিলেটে বানভাসি মানুষের মধ্যে বাসদের ত্রাণ বিতরণ

২ জুলাই টুকেরবাজারের নয়াবাজার এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কালে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ সিলেট জেলা আহ্বায়ক আবু জাফর ও জেলা শাখার সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পাল, মনজুর আহমদ, নুরুল আহমদ, আনোয়ার হোসেন, খানাই মিয়া, জয়নাল আহমদ,

আনোয়ার হোসেন কুটি, হৃদয় আহমদ, সুমন আহমদ, ইব্রাহিম হোসেন প্রমুখ।

উল্লেখ্য, বাসদ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট তার সীমিত সাধ্য অনুযায়ী, অন্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ধারাবাহিকভাবে কয়েক দফা ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে বানভাসি মানুষের পাশে দাঁড়ায়।



বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সিরাজুল আলম খান

দশম পৃষ্ঠার পর

মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা বিশাল যুব শক্তিকে লুটপাট, অপকর্মের বাইরে রাখার এবং একটি সংগ্রামী চেতনার নববিন্যাস রচনা করার কৃতিত্ব সিরাজুল আলম খানকে অবশ্যই দিতে হবে। সব কাজ সঠিক পথে সঠিকভাবে এগিয়ে নিতে পেরেছেন কিনা সেটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। সে দায় দায়িত্বের বাইরেও তিনি যেতে পারেননি। অনেকে মনে করেন ভারতও চাইছিল, ভারত বিরোধী নয় এবং আপেক্ষিক উদার গণতান্ত্রিক একটা বিরোধী দল গড়ে উঠুক যাতে ক্ষমতার ও সম্পর্কের একটা ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। জাসদ এর মতো একটা সংগঠন সে চাহিদা পূরণ করতে পারতো এবং আওয়ামী লীগের বড় মাপের অনেক নেতাও তাতে शामिल হতে পারতো। এ ধরনের কিছু কথাবার্তা বা সমঝোতার কথাও শোনা যায়। কিন্তু বাধ সেধেছে শ্রেণি সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগানে। যে কারণে আওয়ামী লীগের অনেকের আসার কথা শোনা গেলেও নেতৃত্বানীয়া কাউকেই পাওয়া যায়নি।

জাসদ রাজনীতির আওয়াজ এবং নানামুখী

সমর্থন সারা দেশে ছড়িয়ে যায় দ্রুততম সময়ে। ঘরে ঘরে সমাজতন্ত্রের কথা পৌঁছে যায়। সনাতন বামপন্থীদের বড় শক্তি কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ (মোজাফফর) আওয়ামী লীগের সহযোগী হওয়ায় এবং পিকিংপন্থি বামপন্থিরা ক্ষুদ্র পরিসরে জানবাজি রাখা লড়াই করা সত্ত্বেও যে শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বকারী ও বিজয়ী দল আওয়ামী লীগকে মোকাবিলা করার মতো দৃশ্যমান শক্তি না থাকায় যে শূন্যতা তৈরি হয়েছিল জাসদের বলিষ্ঠ প্রতিরোধের বাধভাঙা জোয়ার তা পূরণ করে দেয়। দল গঠনের ১ বছরের মাথায় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ দুই শতাধিক সংসদীয় আসনে জাসদ প্রার্থী দেয়। আওয়ামী লীগের জুলুম জবরদস্তি ও জালিয়াতিতে মাত্র ১টি আসনে জয় দেখানো হয়। সর্বমোট ৭ জন বিজয়ী ঘোষিত হয়, যেখানে ২০ থেকে ২৫ জন জয়ী হতে পারতো। ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকট, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তপনা, রাষ্ট্রীয় নিপীড়নে জনবিক্ষোভ বাড়তে থাকে। জাসদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যাপক জনসম্পৃক্ততা ঘটতে থাকে।

১৯৭৪ সালে ১৭ মার্চ কর্মসূচিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর



প্রগতিশীল আইনজীবী ফ্রন্টের প্রতিনিধিসভা ২৮ জুন ডাকসু ফ্যাফেটেরিয়াতে অ্যাড. শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ও উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান।

বাসভবনে স্মারকলিপি দিতে গেলে গুলিতে কয়েকজন মৃত্যুবরণ করেন। মেজর জলিল, আসম রবসহ বহু নেতাকর্মী গ্রেপ্তার হন। চরম নির্যাতন নেমে আসে। এ সময় প্রয়োজন ছিল মওলানা ভাসানীকে সামনে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ বামগণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততায় গণবাহিনী গঠন ও কার্যক্রম ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। এর পর রাষ্ট্র শক্তির ক্রমাগত আক্রমণ ও একের পর এক ভুল পদক্ষেপের কারণে জাসদ ক্রমাগত শক্তি ক্ষয় করতে ও জনবিচ্ছিন্ন হতে থাকে। ভাসানীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন রচনা করা গেলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নৃশংস সামরিক অভ্যুত্থানে স্বপরিবারে মুজিব হত্যা না হয়ে হতে পারতো গণঅভ্যুত্থানে মুজিব সরকারের পতন। এরপর সুযোগ আসে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর। ৭ নভেম্বরের বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সামরিক স্বৈরতন্ত্র বেসামরিক স্বৈরশাসনের স্থান দখল করে। এ ঘটনার দায়িত্ব সিরাজুল আলম খান পুরোপুরি গ্রহণ করতে রাজি না হলেও ক্ষয় থেকে জয়ের

সভায় সভায় ২৮ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সম্মেলন এবং ৩০ নভেম্বরের মধ্যে জেলা কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সভায় অ্যাড. সাইফুল ইসলাম পল্টুকে আহ্বায়ক ও অ্যাড. ফারুক হোসেনকে সদস্যসচিব করে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

পথে রাজনীতিকে আর ফিরাতে পারলো না। যেটা রুশ বিপ্লবের নেতা কমরেড লেনিন পেরেছিলেন, ১৯০৫ সালের ব্যর্থ বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়ে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সফল করতে। সে সময় থেকে সিরাজুল আলম খানের চিন্তাজগতে নতুন মোড় নেয়। শ্রেণি সংগ্রামের বদলে শ্রেণি সমন্বয়ের একটা কৌশল অবলম্বনের চেষ্টা চলতে থাকে। তারপর থেকে সিরাজুল আলম খানের সাথে আমাদের সাংগঠনিক সম্পর্ক আর থাকেনি। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার স্নেহ, ভালবাসা আর উৎসাহ দান থেকে কখনো বঞ্চিত হইনি। ব্যক্তিগত খ্যাতি, সহায় সম্পদ অর্জন ইত্যাদির দিকে কোনদিন তিনি মুখ ফেরাননি। অনেক ভুল ভ্রান্তির পরেও রাজনৈতিক চরিত্র বিসর্জন দেননি। বিশাল পরিচিতিতে ব্যক্তিগত স্বার্থের কাজে ব্যবহার করেননি। সিরাজুল আলম খান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বাধীন বাংলাদেশে বিপ্লবী গণজাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন, সেজন্য গভীর শ্রদ্ধায় তাঁকে স্মরণে রাখি। কমরেড সিরাজুল আলম খান লাল সালাম।

সিলেট নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা সমস্যা ও নদী ভাঙ্গন রোধে স্থায়ী সমাধান কর



সিলেট নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, বন্যা সমস্যা ও নদী ভাঙ্গন রোধে স্থায়ী সমাধান, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ২৯ জুন শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও শহিদ মিনারের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদ সিলেট জেলা আহ্বায়ক আবু জাফরের

সভাপতিত্বে ও জেলা শাখার সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পালের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রুমন বিশ্বাস, মামুন বেপারি, মনজুর আহমদ, শহীদ মিয়া, নুরুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন, আকবর আলি, জুয়েল আহমদ, সমছু মিয়া, অডি ইসলাম, বাবলা আহমদ, কিরন মিয়া, হেলাল আহমদ, হৃদয় আহমদ প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বন্যা প্রাকৃতিক হলেও এর মারাত্মক দুর্ভোগের জন্য দায়ী মনুষ্যসৃষ্ট কারণ। গত ৫২ বছরে দূষণ, ভূমিদস্যদের আগ্রাসন, নদী-খাল খনন না করা, অপরিষ্কার রাস্তাঘাট, শিল্পায়নে যথেষ্টভাবে, পরিবেশ বিধ্বংসী নগরায়ন, নিয়মবহির্ভূত আবাসন, সেতু-কালভার্ট ও স্লুইসগেট নির্মাণের ফলে দেশের নদীগুলোর স্বাভাবিক গতিপথ বন্ধ হয়ে বর্ষায় বৃষ্টির পানি ও উজান থেকে আসা পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়াও ভরাট ও ধ্বংস করা হয়েছে খাল, হাওর ও জলাশয়। তাছাড়া

সুরমা নদীর পরিকল্পিত খনন না করার ফলে জলাবদ্ধতা বাড়ছে এবং বন্যা সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বিগত বছরগুলোতে সিলেট নগরীতে জলাবদ্ধতা নিরসনে শত শত কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সামান্য বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়, আর অপরিষ্কার উন্নয়নের খেঁসারত দিচ্ছে সাধারণ মানুষ।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সিলেট অঞ্চলের নদীগুলো পরিকল্পিত ড্রেজিং করা, অপরিষ্কার নগরায়ন-উন্নয়ন বন্ধ, নদী-খাল, জলাশয় দখল-ভরাটসহ প্রকৃতি বিনাসী সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ এবং বন্যা সমস্যার ও জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানান।

বক্তারা নগরীর বন্যা সমস্যার ও জলাবদ্ধতার স্থায়ী সমাধান, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের দ্রুত পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলনের অংশ হিসেবে আগামী ২ মাসব্যাপী মতবিনিময়সভা, পথসভা, গণসংযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

বাজেট বরাদ্দের দাবিতে মহিলা ফোরামের সমাবেশ ও অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ



নারীর গৃহস্থালি কাজের আর্থিক মূল্য রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরূপণ ও স্বীকৃতি দাবি

নারীর গৃহস্থালি কাজের আর্থিক মূল্য রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরূপণ ও স্বীকৃতি, সরকারিভাবে ডে-কেয়ার সেন্টার, কর্মজীবী নারী হোস্টেল নির্মাণ এবং নারীর স্বাস্থ্য-শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাজেট বরাদ্দের দাবিতে ২৩ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. দিলরুবা নূরীর পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি দীপালি রাণী, সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মনীষা চক্রবর্তী, দপ্তর সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা, অর্থ সম্পাদক কোহিনূর আক্তার কনা, ঢাকা নগর শাখার সভাপতি সেলিনা ইয়াসমিন কনা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়ে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, এমন কোন কাজ নেই যার ফলাফল নেই। সেটা ছোট হোক বা বড় হোক তার প্রভাব পড়বেই। কিন্তু এমন অনেক কাজ আছে যে কাজের ফলাফল ছাড়া দৈনন্দিন জীবন অচল হয়ে পড়ে। মানুষের শারীরিক-মানসিক, সাংস্কৃতিক জীবন বিকশিত হওয়া তো

দূরের কথা টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়ে কিন্তু সে কাজের কোন স্বীকৃতি নেই, মর্যাদা নেই এমনকি তাচ্ছিল্য করা হয় সবসময় আর কোনো পারিশ্রমিকও নেই। এই স্বীকৃতিবিহীন, মর্যাদাবিহীন, মজুরিবিহীন কাজের নাম গৃহস্থালি কাজ। এইসব কাজের ৮০ ভাগের বেশি করেন নারীরা। উদযুক্ত ক্লাস্তিকর এই গৃহস্থালি কাজ ছাড়া সমাজ ও পরিবার টিকে থাকা অসম্ভব। নারীর কাজের অর্থনৈতিক অবদান প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমত, মজুরির বিনিময়ে কাজ এবং টাকা উপার্জনের জন্য স্বনিয়োজিত কাজ, যা জিডিপির হিসাবে যুক্ত হয়। দ্বিতীয়ত, নারীর মজুরিবিহীন কিছু পারিবারিক কাজ যেমন-হাঁস, মুরগি, গরু-ছাগল পালন করে বিক্রি করা ইত্যাদি, এর আর্থিক মূল্য জিডিপিতে যুক্ত হয়। তৃতীয়ত, নারীর গৃহস্থালি কাজ, যার বাজার মূল্য বা বিনিময় মূল্য নেই, যা বাজারজাত করা যায় না তা জিডিপিতে যুক্ত হয় না এমন কি শ্রম শক্তি হিসেবেও গণ্য হয় না।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, মহিলা ফোরাম মনে করে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কাজের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। সম-অধিকার নিশ্চিত করা এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে সমাজে ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে যেসকল প্রতিবন্ধকতা তা দূর করার কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং সেসকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে বাজেটে পরিকল্পনা ও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখতে হবে। পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর শ্রমের অবদানের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে।

শহিদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত



বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ ও সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম ফরিদপুর জেলা শাখার উদ্যোগে শহিদ জননী জাহানারা ইমামের ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে ৩০ জুন ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম জোন-৭ বৃহত্তর ফরিদপুরের ইনচার্জ মাহমুদা হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি

প্রকৌশলী শম্পা বসু, বাসদ ফরিদপুর অঞ্চল কমিটির আহ্বায়ক মোসাদ্দেক হোসেন ঢালী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা অশোক সিংহ রায়, ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ ফরিদপুর জেলা কমিটির আহ্বায়ক সজল বাউড়ে ও সংগঠক শুভ দে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ ফরিদপুর জেলা কমিটির সদস্য কৌশিক অধিকারী।

মেট্রোরেল ভাট আরপের চক্রান্ত বন্ধের দাবিতে এনবিআর-এর চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপি পেশ

মেট্রোরেলের ভাড়া কমানো, ছাত্রদের হাফ পাস এবং ভাট যুক্ত না করার দাবিতে বাম গণতান্ত্রিক জোট ঢাকা মহানগরের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১০ জুন আগারগাঁও মেট্রো স্টেশনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে মিছিল করে আগারগাঁও অবস্থিত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউয়ের কার্যালয়ে চেয়ারম্যান বরাবর

স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

জোটের ঢাকা মহানগরের সমন্বয়ক তৈমুর খান অপূর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আব্দুল আলী, খালেদুজ্জামান লিপন, ডা. সাজেদুল হক রুবেল, সাইফুল ইসলাম সমীর, খান আসাদুজ্জামান মাসুম, নাসির উদ্দিন খ্রিস্ট, রাশেদ শাহরিয়ার, মুক্তা বাউড়ে, শহিদুল ইসলাম সবুজ।



কোটা ব্যবস্থার সংস্কার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির আন্দোলন শক্তিশালী করুন

শেষ পৃষ্ঠার পর

এগিয়ে চলেন। সমস্যা হলো এই সকল অংশের মানুষদের সামাজিকভাবে এগিয়ে আনার জন্য গত প্রায় অর্ধ শতাব্দীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে বিশেষ কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি। আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলে স্থাপিত হয়নি পর্যাপ্ত স্কুল। আদিবাসীদের একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত মাতৃ ভাষায় শিক্ষার অধিকার বা আয়োজন নিশ্চিত করা যায়নি। নারীদেরও এখনও নানা সামাজিক বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। নারীর সামাজিক মর্যাদা কিংবা নারী-পুরুষের সমতার সমাজ এখনও সুদূরে অবস্থান করছে। শহরাঞ্চলে নারীদের চলাফেরা কিংবা কাজ কর্মে অংশগ্রহণের একটা খণ্ডিত চিত্র দেখে গোটা দেশের নারী সমাজের চিত্র বোঝা দুরূহ। পুঁজিবাদ তার নিজের প্রয়োজনেই নারীকে কিছু আপেক্ষিক স্বাধীনতা দিয়ে সস্তা শ্রম শোষণের জন্য ঘরের বাইরে বের করলেও বিভিন্ন সেক্টরে এখনও নিশ্চিত করা যায়নি নিরাপদ কর্মপরিবেশসহ সমকাজে সমমজুরি। তার উপর মৌলবাদ ও শরিয়াহ আইনের নানা বিদ্বেষমূলক প্রয়োগ তো আছেই। এভাবে কোটার পাশাপাশি রাষ্ট্রের যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে সমাজের সকল মানুষের সমতা বিধানের দায়িত্ব ছিল তা হয়ে আছে উপেক্ষিত।

বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে সাম্য, সুযোগের সমতা ও বৈষম্যহীনতা। আবার এই সমতার নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন, সংবিধানের ২৯ অনুচ্ছেদে বলা আছে, নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশ যাতে সরকারি চাকরিতে ‘উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব’ লাভ করতে পারে, সে জন্য ‘বিশেষ বিধান’ প্রণয়ন করা যাবে। এই বিধান বলে নাগরিকদের ‘অনগ্রসর’ অংশের জন্য সরকারি চাকরিতে কোটার বিধান করা অসাংবিধানিক হবে না। কিন্তু সমস্যা বাধল, কারা এই অনগ্রসর শ্রেণি কিংবা উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব বলতে কী বোঝায় তাই নিয়ে। আর মূল বিতর্কটা আসে মুক্তিযোদ্ধাদের এমনকি তাঁদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য কোটার সুবিধা সরক্ষণের প্রশ্নে।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে, পরিবারেরসমূহ নিশ্চিত বিপদ জেনেও যারা দেশের মুক্তির জন্য নিজেদের উৎসর্গ করতে সঁপে দিয়েছিলেন তাঁদের সেই আত্মত্যাগ আর সাহসী ভূমিকা এ জাতি কখনোই বিস্মৃত হবে না। একটা কথা মনে রাখতে হবে

অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কোটা কোনো সুবিধা নয়, এটা এটা তাদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কোটা নিয়ে বিতর্কের আড়ালে যেন মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধাদেরকে অসম্মান করা না হয়। যোগ্যতা, মেধা এর প্রতিপক্ষ হিসেবে কোটাকে দাঁড় না করিয়ে কোটা ব্যবস্থার সংস্কার করা জরুরি। ছাত্রদের প্রতি আমাদের আহ্বান শূন্য পদে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি বন্ধ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন। অল্প কিছু সংখ্যক রাজাকার-আল বদর বাদ দিলে গোটা দেশের সে সময়ের সাত কোটি মানুষই মুক্তির লড়াইয়ে शामिल হয়েছিলেন। এর মধ্যে কেউ ছিলেন সম্মুখসারিতে কেউ বা পেছন থেকে রসদ জুগিয়েছেন। একথা নিশ্চিত করে বলা যায় আমাদের মুক্তিযোদ্ধারাও কোন বস্তগত লাভের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে এই লড়াইয়ে शामिल হননি। ১৯৭২ সালে গণপরিষদে সংবিধান নিয়ে বিতর্ককালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মদান, অবদান ও প্রত্যাশা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান প্রসঙ্গে যুদ্ধাহত পঙ্গু ও নিহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় (বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক, ১৯৭২, পৃষ্ঠা ৪৭০-১)। সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা প্রবর্তনের সময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে একে সম্পর্কিত করা হয়নি। সে সময়ে ১৯৭২ সালে প্রণীত ইন্টেরিম (বা অন্তর্বর্তীকালীন) রিক্রুটমেন্ট পলিসিতে মুক্তিযোদ্ধাদের ৩০ শতাংশ কোটার কথা বলা হয়। অন্তর্বর্তীকালীন মানেই হচ্ছে এটা স্বল্পকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য। ১৯৭৭ সালে তৎকালীন পে ও সার্ভিস কমিশনের একজন বাদে বাকি সব সদস্য তাই সরকারি নিয়োগে কোটাব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। কমিশনের সদস্যদের মধ্যে মাত্র একজন প্রচলিত কোটাসমূহ বহাল রেখে ১৯৮৭ থেকে পরবর্তী ১০ বছরে ধীরে ধীরে কমিয়ে তা বিলুপ্ত করার পক্ষে মত দেন। অথচ ১৯৯৭ সালেই এই কোটাব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের ও পরে তাঁদের নাতি নাতনিদের এর আওতাভুক্ত করা হয় এবং তাঁদের পাওয়া না গেলে তাঁদের জন্য নির্ধারিত পদগুলো শূন্য রাখার নীতি গৃহীত হয়। ফলত কোটা ব্যবস্থা একটা বৈষম্য সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা হিসেবে আবির্ভূত হয় যেখানে মেধার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার সুযোগ মারাত্মকভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ে।

কৃষক ও কৃষি বাঁচাতে বাজেটে কৃষি খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধির আন্দোলন চলবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বাড়়ে। কর্মসূচি শেষে নিখিল দাস ও জুলফিকার আলীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সমাবেশে কমরেড ফিরোজ বলেন, আমাদের দেশে ২ কোটি ৫১ লাখ কৃষক ও ১ কোটি ৬২ লাখ কৃষি পরিবার। এক পরিবার (খানা) সমান ৪ জন হলে কৃষি পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ কোটি ৪৮ লাখ। গ্রামে বসবাসরত মানুষের সংখ্যা ৬৮.৩৪ শতাংশ। ইতিহাস-ঐতিহ্য ও আর্থসামাজিক কারণে দেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে যুক্ত। জিডিপিতে কৃষির অবদান ১১ দশমিক ২ শতাংশ। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কৃষক ধান-গমসহ দানাদার শস্য, ফলমূল, মাছ-মাংস, দুধ-ডিম, সবজিসহ কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রেখে ১৭ কোটি মানুষের চাদিহা পূরণ করে চলছে।

নানা অভিঘাত মোকাবিলা করেও কৃষক-খেতমজুররা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেশের কৃষি উৎপাদন। বন্যা-খরা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা এমনকি করোনা মহামারির ভয়াবহতাসহ প্রাকৃতিক

দুর্যোগের মধ্যেও উৎপাদন ধরে রেখেছেন কৃষক।

ইতিমধ্যে আরও একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে সামনে এসেছে তাপপ্রবাহ। এ বছর তাপদাহে পুড়েছে সোনালি ফসল।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশের কৃষকরা ধান উৎপাদনে দেশকে বিশ্বের তৃতীয় স্থানে উন্নীত করেছে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন উন্নীত করেছে প্রায় ৪ কোটি ৫৩ লাখ ৪৪ হাজার মেট্রিক টনে। ৬০ ধরনের প্রায় ১ কোটি ৬০ লাখ টন বৈচিত্র্যপূর্ণ সবজি উৎপাদন করে বিশ্বে তৃতীয়, আলু উৎপাদনে ষষ্ঠ, আম উৎপাদনে সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম স্থানে আছে বাংলাদেশ। অর্থাৎ শত প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে প্রতিটি ক্ষেত্রে কৃষক উৎপাদন বাড়িয়ে চলছে। এত অবদান সত্ত্বেও কৃষি, কৃষক ও খেতমজুরদের বাঁচাতে জাতীয় বাজেটে কৃষি বরাদ্দ বাড়ছে না বরং প্রতিবছরই বরাদ্দ কমছে।

তিনি বলেন, বাজেট শুধুমাত্র একটা আর্থিক বিবৃতি নয়, সেটা শাসকদের শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ। কৃষি সম্পর্কে সরকারের মনোভাবও বাজেটের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। এবারের

আরও কিছু বিষয় এখানে আলোচনায় আনা জরুরি। আমাদের দেশের সর্বশেষ কোটা ব্যবস্থায় কোটার ভিত্তিতে ৫৬ শতাংশ এবং মেধার ভিত্তিতে মাত্র ৪৪ শতাংশ নিয়োগের বিধান ছিল। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ড. আকবর আলি খান রেগুলেটরি কমিশনের প্রধান হিসেবে ২০০৮ সালের মার্চ মাসে কোটাব্যবস্থা নিয়ে একটি গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। এই গবেষণার সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে মেধার ভিত্তিতে মাত্র শতকরা ৪৫ জনকে (তখনকার হিসাবে) নিয়োগ সংবিধানসম্মত নয়। সংবিধান বৈষম্যহীনতার কথা বলেছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যতিক্রম হিসেবে (যেমন সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির জন্য) কোটাকে অনুমোদন করেছে। ব্যতিক্রমী নিয়োগ (শতকরা ৫৫ ভাগ) কখনো সাধারণ নিয়োগের (শতকরা ৪৫ ভাগ) চেয়ে বেশি হতে পারে না। আবার কোটার সুবিধা কতবার প্রয়োগ করা যাবে সেটাও বিবেচনায় আনা জরুরি। যেমন, একবার যদি সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে কোটার সুবিধা নেয় এরপর আবার সেই ব্যক্তি চাকরির ক্ষেত্রেও কোটার সুবিধা পাবে কিনা সে সংক্রান্ত কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা নেই। ফলে কোটার এই আধিক্য সমাজে সীমাহীন বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। দেখা যাচ্ছিল মেধাতালিকায় সামনের সারিতে থেকে অনেকে চাকরি পাচ্ছেন না আবার কোটার সুবিধার কারণে বহু পেছনে থেকেও অনেকে চাকরি পেয়ে যাচ্ছেন। এত ব্যাপক হারে কোটা যাঁদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল, তাঁরা কোটার সমসংখ্যক পদে নিয়োগ পরীক্ষায় পাসও করেননি কখনো। এ কারণে ২৮তম থেকে ৩১তম বিসিএসে ৩ হাজার ১৬২টি পদ শূন্য ছিল। অথচ সম্মিলিত মেধাতালিকায় ওপরের দিকে অবস্থান করেও অনেকে চাকরি পাননি। গত ফেব্রুয়ারি মাসে জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন জানিয়েছেন, সরকারি চাকরিতে ৫ লাখ ৩ হাজার ৩৩৩টি শূন্য পদ রয়েছে। একদিকে এই বিশাল শূন্য পদের বহর আবার অন্যদিকে এই বিশাল সংখ্যক কোটার চাপ চাকরিপ্রত্যাশী যুব সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তার উপরে মুক্তিযোদ্ধা কোটা নিয়ে দুর্নীতি, ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদ দেয়া ইত্যাদি নানা কিছু মিলিয়ে গোটা পরিস্থিতি বিষময় হয়ে উঠেছে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ পরপর চারবার সরকার গঠন করেছে। ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর ২০১৪ সালে বিনা ভোটে, ২০১৮ সালে প্রশাসনিক কারসাজিতে দিনের ভোট রাতে করে এবং ২০২৪ সালে আমি-ডামির

প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন ভোট করে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে তারা গদিনসীন হয়ে আছে। দুর্নীতি-লুটপাট আর জনগণের উপর নির্যাতন-নিপীড়নের সকল রেকর্ড তারা অতিক্রম করেছে। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইত্যাদিকে তারা নিজেদের মত ব্যাখ্যা করে একে রাজনৈতিকভাবে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। নিজেদের বহু কুকর্মকে তারা আড়াল করছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে। সরকারের কিংবা আওয়ামী লীগের সমালোচনা করলেই তাকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী হিসেবে ট্যাগ করার চেষ্টা করেছে। আর এর ফলে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে জনমনে যে শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ ছিল তাকে বিতর্কিত করেছে ফলস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং তার নাতি নাতনিদের জন্য এই বিশাল কোটার ভার তরণদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি করেছে।

স্বাধীনতার ৫৩ বছর অতিক্রান্ত হতে যাচ্ছে। শোষণমুক্ত পরিকল্পিত অর্থনীতি গড়ে তোলার যে স্বপ্ন মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের এ জাতির ছিল, তাকে ধুলিস্যাত করা হয়েছে। জাতীয় শিল্প ও অর্থনীতির বিকাশের বদলে সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি ও দেশকে বহুজাতিকের বাজারে পরিণত করা হয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। আর পুঁজিবাদের অনুশঙ্গ হিসেবেই আসে বেকারত্ব। পুঁজিবাদ বিশাল পরিমাণ বেকার বাহিনী তৈরি করে সস্তা শ্রম শোষণ করে। তাই তো আমরা দেখি শুধু আমাদের দেশ নয় গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়াজুড়েই বেকার সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই শ্রমশক্তির ৪% মানুষ বেকার। আমাদের দেশে এই বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি। দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৩.৫১ শতাংশ বেকার। মূল সংকট এই পুঁজিবাদী আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা। ফলে, বেকারত্ব, অনাহার দূর করে শিক্ষা-চিকিৎসা, বাসস্থান, কাজ তথা মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সাথে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থাৎ ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজের অবসান ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানার সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুবসমাজসহ দেশবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারকেও অনুরাগ-বিরাগ, অবেগের বশবর্তী কিংবা একগোয়েমি মনোভাব পোষণ না করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

বাজেটেও তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

সরকার প্রতিবছর আমলা প্রশাসন, ব্যবসায়ী-এনজিওদের সাথে বৈঠক করে, অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান আইএমএফ, বিশ্ববাংকসহ অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শে বাজেট প্রণয়ন করে। যারা বাজেট প্রণয়ন করেন, তাদের সাথে মাঠের কৃষকের কোন সম্পর্ক নেই, কৃষক সংগঠনসমূহের সাথেও তারা কোনো আলাপ-আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। কৃষকের জীবনের বাস্তব সমস্যা ও তার উত্তোরণের সাথে যে তাদের সম্পর্ক নেই তার প্রকাশ আমরা বাজেটে দেখি। শুধু কৃষি খাতই নয় দেশের অর্থনীতির যারা মূল ভিত্তি দেশে-বিদেশে কর্মরত শ্রমিক তাদের জীবনমান উন্নয়নে বাজেট নামমাত্র। কৃষক-শ্রমিকের জন্য, রেশনিং ব্যবস্থা, সহজ লভ্য চিকিৎসা, সামাজিক সুরক্ষায় উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়তে হবে, এর জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

নেতুবন্দ বলেন, প্রতি বছর বাজেটে আকার বাড়়ে কিন্তু কৃষি খাতে বরাদ্দ আনুপাতিক হারে ক্রমাগত কমে। কৃষকরা দেশের অর্থনীতিতে

প্রত্যক্ষ যে অবদান রাখে তার তুলনায় বাজেট অর্ধেকেরও কম। গত এক যুগে কৃষি খাতে বরাদ্দ নেমেছে অর্ধেকে। বাজেটে কৃষি-কৃষক ও খেতমজুর বাঁচাতে জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন বরাদ্দের ৪০ শতাংশ কৃষি খাতে বরাদ্দের জোর দাবি জানান নেতুবন্দ।

দাবি পক্ষের কর্মসূচি থেকে নেতুবন্দ কৃষক ফ্রন্টের ১১ দফা দাবি উত্থাপন করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

দাবি পক্ষে ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রাজশাহীর বাগমারা, নাটোর, কুমিল্লা, গাইবান্ধা, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর, পাবনা, রংপুর, নীলফামারীর ডিমলা, কুড়িগ্রাম, ফরিদপুর, ফেনী, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুরের কমলনগর, চট্টগ্রামের পটিয়াসহ বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় সমাবেশ, মানববন্ধন, মিছিল কর্মসূচি পালিত হয় এবং ২৬ জুন জেলা প্রশাসক, ইউএনও-র মাধ্যমে স্মারকলিপি অর্থমন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হয়।

লোক দেখানো মামলা নয়, দুর্নীতিবাজদের গ্রেপ্তার কর-পৃষ্ঠপোষকদের মুখোশ উন্মোচন কর



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

দুর্নীতিবাজ, অর্থপাচারকারী, ঋণখেলাপি ও কালোটিকার মালিকদের নামের তালিকাসহ শ্রেষ্ঠতর প্রকাশ, অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং দোষীদের বিচারের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ৩১ মে '২৪ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে সেগুনবাগিচাস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড

রাজেকুজ্জামান রতন, সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য নিখিল দাস, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরামের সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের দুঃশাসনে দেশের জনগণ জিম্মি। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতি, লুটপাট আজ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজীরের অবৈধ সম্পদের যে বিবরণ পত্রিকায় এসেছে তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। এমন বহু বেনজীরের অন্তিম দেশে রয়েছে। বেনজীরের অবৈধ সম্পদ তো রাতারাতি হয়নি। রাষ্ট্র-সরকারের চোখের সামনেই এটি গড়ে উঠেছে। বেনজীর ২০১১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে পুলিশের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'বিপিএম' ৫ বার এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

কোটা ব্যবস্থার সংস্কার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির আন্দোলন শক্তিশালী করুন

সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার পুনর্বহাল নিয়ে আবারও বিতর্ক চলছে। কোটা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে এক তীব্র ছাত্র বিক্ষোভের মুখে অনেকটা আবেগতড়িত হয়ে সকল কোটা বাদ দেয়ার এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার। তখন অনেকেই বলেছিল ছাত্ররা তো দাবি করেছিল কোটা ব্যবস্থাকে সংস্কার করা হোক কিন্তু কোটা পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিলোপ তো চাওয়া হয়নি। এতে কি আসলেই সমস্যার সমাধান হবে? সরকারের এই আবেগপূর্ণ সিদ্ধান্ত কি আরও গভীর কোন সংকটের দিকে দেশকে নিয়ে যাবে?

সম্প্রতি দেখা গেল সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল করে ২০১৮ সালে জারি করা পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। ফলে সরকারি চাকরিতে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা বহাল থাকবে। এ-সংক্রান্ত রিটে এর আগে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে বিচারপতি কেএম কামরুল কাদের ও বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত একটি হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ এ রায় দেয়। নবম থেকে ১৩তম গ্রেড পর্যন্ত সরাসরি নিয়োগে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল করে ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর একটি পরিপত্র জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। পরিপত্রটির মাধ্যমে ওই পাঁচটি গ্রেডের পদগুলোয় সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ নারী কোটা, ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা, ১০ শতাংশ জেলা কোটা, ৫ শতাংশ উপজাতি কোটা ও ১ শতাংশ প্রতিবন্ধী কোটা বাতিল করা হয়। সেই সঙ্গে বলা হয়, এ পদগুলোয় সরাসরি নিয়োগের

ক্ষেত্রে মেধাতালিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে হবে। পরিপত্রের ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও প্রজন্ম কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সভাপতি অহিদুল ইসলাম তুষারসহ সাত জন। পরে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। সে রুলই যথাযথ ঘোষণা করে রায় দিল হাইকোর্ট।

উচ্চাঙ্গের এই রায়ের ফলে সরকারি চাকরিতে আবারও পূর্বের কোটা ব্যবস্থা ফিরে এলো। আর এর প্রতিক্রিয়াও ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও নানা আলোচনা-সমালোচনা চলছে।

সমাজের বিভিন্ন অনগ্রসর অংশকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে মূল শ্রোতে নিয়ে আসার জন্য সারা দুনিয়াতেই কোটা বা বিশেষ সুবিধা দেয়া একটা পরিচিত পদ্ধতি। আবার এটাও মাথায় রাখা জরুরি যে কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করাই হয় ক্রমেই এর বিলোপ সাধনের জন্য। অর্থাৎ কোটা কোন চিরস্থায়ী পদ্ধতি নয়। কোটা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয় তাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের অনগ্রসর অংশের মানুষ ক্রমেই নিজেকে সমাজের মূলধারার সাথে লীন হতে পারবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত। আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী, নারী কিংবা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী মানুষেরা এখনও নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে জীবনে এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

কৃষক ও কৃষি বাঁচাতে বাজেটে কৃষি বরাদ্দ বাড়াও



কৃষি ফসলের লাভজনক দাম ও রেশন নিশ্চিত কর

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট

কৃষি-কৃষক, খেতমজুর বাঁচাতে জাতীয় বাজেটের ৪০ শতাংশ কৃষিখাতে বরাদ্দ করা, কৃষি ফসলের লাভজনক দাম, আর্মি রেটে রেশনসহ ১১ দফা দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে ১০ থেকে ২৫ মে ২০২৪ দেশব্যাপী দাবি পক্ষ পালন ও ২৬ মে কেন্দ্রীয়ভাবে অর্থমন্ত্রীর নিকট এবং জেলায় ডিসি ও ইউএনও-এর মাধ্যমে অর্থমন্ত্রীর বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও অর্থমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান
ঢাকায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে ও সহসম্পাদক নিখিল দাসের পরিচালনায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক জুলফিকার আলী, সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপন, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের দপ্তর সম্পাদক রুখসানা আফরোজ আশা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

৩০ জুন সাঁওতাল বিদ্রোহ (হুল) দিবস পালিত

৩০ জুন সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস। এ বছর সাঁওতাল বিদ্রোহের ১৬৯ বছর। ইংরেজ সরকার ও দেশি জমিদারদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা, অতিমাত্রায় রাজস্ব নির্ধারণ, মহাজন-ব্যবসায়ীদের প্রতারণা বন্ধের দাবিতে ১৮৫৫ এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহে সিধু-কানু, দাদ-ভৈরব, ফুলমণিরা জীবন দিয়ে যে সংগ্রামের সূচনা করেছিল তা ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতবর্ষে। পরবর্তীতে সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), নীল বিদ্রোহ (১৮৬০), সারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসের এই সংগ্রামী শিক্ষাকে স্মরণ করে বাংলাদেশের

সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ও সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে নওগাঁ, জয়পুরহাট, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মিছিল সমাবেশ ও আলোচনা সভার মধ্যদিয়ে এই দিবসটি পালন করা হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অতি দরিদ্র, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত এই জনগোষ্ঠীর এখনও জীবনমান উন্নয়নে সরকার কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। আদিবাসীদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, সকল প্রকার নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে।



৩০ জুন নওগাঁ জেলায় সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে আদিবাসী সমাবেশ অনুষ্ঠিত